# কেন ভালোবাসা

জনমেজয়



মৌসুমী প্রকাশনা ॥ কলিকাতা-বা

পরিবেশক — করুণা প্রকাশনী, ১. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক—
শ্রীদেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫।১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক—
শ্রীরতিকান্ত বেরা
নিউ লাইট প্রিণ্টার্স
৫ অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
প্রবোধ দাশ

দাম—পাঁচ টাকা



# কেন ভালোবাসা

জনমেজয়

দাম—পাঁচ টাকা



# নারী

প্রায় প্রতিদিন মধ্যরাতে সেই কালো চুল নোংরা, ছেঁড়া পোশাক-পরা বালিকাটিকে দেখা যেতো ; অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গীতে প্রাসাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শহরের দিকে চলে যেত সে। প্রাসাদের প্রহরীদের বড় মায়া হত এ বালিকাটিকে দেখে। তাকে এক পলক দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, সারা দিনের অপরিসীম পরিশ্রমে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ; ক্লান্তিতে নিদ্রায় বুঝি ভালো করে মাটিতে পা ফেলতে পারছে না বেচারী। প্রহরীদের মনে মায়া জাগিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যেত সে, তারপর প্রাসাদের আলোকিত সদর রাস্তাটা পার হয়ে ক্রমশ তার চলার গতিটা বাড়ত, তারপর শহরের জনবহুল রাস্তায় নেমে দ্রুত গতিতে একটা নির্দিষ্ট পানশালার লম্বা ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ত।

এইভাবে প্রতিদিনই মধ্যরাত্রে এক নিপুণা অভিনেত্রীর মত এক দুঃখী বালিকার ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতেন পঞ্চাম

বছরের রোম সম্রাট থিবেরিয়াস ক্লডিয়াস ড্রুসুস সিজারের ষোলো বছরের পত্নী মিসালিনা। প্রতিদিন রাত্রে নতুন নতুন সুস্থ, সবল যুবকদের জন্য পানশালার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। আর মনোমত কাউকে পাওয়া গেলে এক রাতের জন্য পানভোজন, হইচই হুল্লোড় করে উত্তেজক রজনী কাটিয়ে ভোর নাগাদ চুপি চুপি প্রাসাদে ফিরে এসে নিদ্রিত সম্রাটের বিছানায় শুয়ে থাকতেন নিরপরাধ ভঙ্গিতে।

তার সমস্ত দিনের চালচলনের মধ্যে রাত্রির অসংযম এতটুকুও প্রকাশ পেত না। বরং বড় শান্ত সুশীল দেখাত তাকে সবসময়।

ক্লডিয়াসের সঙ্গে মিসালিনার বিবাহের ব্যাপারটা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ঘটিয়েছিলেন মিসালিনার মা। সবল ও বোকাহাবা ঐ ক্লডিয়াসকে ফাঁদে ফেলতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয়নি। বরং অত্যন্ত সহজেই ক্লডিয়াস মিসালিনার প্রেমের ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন আর ঐ বিবাহের ফলে রোমান ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত, কলঙ্কিত ডোমিসিয়ান পরিবারটি আবার সমাজের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল। যদিও প্রথম দিকে মিসালিনারও ভালো লেগেছিল ঐ পঞ্চান্ন বছরের পেটুক আর বালকস্বভাবের ক্লডিয়াসকে। অদ্ভুত ধরনের একটা ছেলেমানুষী মন ছিল ঐ বিশাল মোটাসোটা চেহারার মানুষটার মধ্যে। রোমের সেই বিখ্যাত এরেনার ভেতর এগারো হাজার বন্য জন্তুর সঙ্গে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের সেই অসম যুদ্ধের উত্তেজক খেলার থেকে, প্রাসাদের মহিলাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলে অনেক বেশী আমোদ পেতেন ক্লডিয়াস। প্রচুর খাদ্য আর অতিরিক্ত মদ্যপানের নেশা তাঁকে সব সময় উত্তেজিত করে রাখত। আর ঐ বালিকা বধূটির প্রতি ছিল তার আন্তরিক অকুণ্ঠ ভালোবাসা। সারাদিন মিসালিনার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার আবোল তাবোল এলোমেলো কথা শুনে কেটে যেত ক্লডিয়াসের। প্রত্যুত্তরে বেশী কথা মুখে জোগাত না তাঁর। যা-ও বা দু'একটা কথা বলতেন মাঝে মাঝে তাতে তাঁর নিবুদ্ধিতাটাই ধরা পড়ত বেশী করে। ভালো

করে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন না তিনি। সব সময়ই তাঁর মুখে লেগে থাকত এক ধরনের অর্থহীন বোকাটে হাসি, চোখের দৃষ্টিতে নির্বোধের কৌতূহল ভেসে বেড়াত। আর দিনের পর দিন পরিবর্তনহীন ক্লডিয়াসের নির্বোধ ভঙ্গীতে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন মিসালিনা। বিয়ের প্রথম বছরটা কোন রকমে মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন কিন্তু পরে অসহ্য হয়ে উঠলে বেশীক্ষণ আর স্বামীর ঘরে কাটাতেন না। ডেকে ডেকেও আর সাড়া পাওয়া যেত না মিসালিনার তিনি তখন কেবল লালসার এক অপরূপ বহ্নির মত উন্মাদ তাড়নায় ছুটে বেড়াতেন সুস্থ সবল যুবকের পেছন পেছন। তাঁদের সাহচর্যে তাঁর রাত্রিগুলো হত উত্তেজনাময়। চরম আনন্দের আশায় তিনি কোন নিয়ম নীতির দাসত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না। বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম জীবনযাত্রা, নৈতিক ব্যভিচার, স্থূল ইন্দ্রিয়ের সেবা করা ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে মিসালিনার জীবনে আর অন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। বন্ধন মুক্ত দাস, অসাধু ব্যবসায়ী আর সমাজবহির্ভূত সব মানুষজন ছিল তাঁর নাগরশ্রেণী।

মনোমত জীবন কাটানোর জন্য প্রাসাদের কয়েকটি গোপন কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল মিসালিনার। আর সেখানেই বসত তাঁর গোপন আসর। একটা জীবন্ত নরক যেন সৃষ্টি হত সেখানে। সেই রতি-রস-চতুরা রমণী উল্লাসে চীৎকার করে উঠতেন কখনও সখনও। ব্যভিচারে মত্ত নরনারীর উল্লাসধ্বনি কখনও বুঝি ক্লডিয়াসের কানে গিয়ে পৌঁছুত। কিন্তু তিনি ভালো করে বুঝে উঠতে পারতেন না ঘটনাটা। বরং মিসালিনার সাহচর্য না পেয়ে তিনি মাঝে মাঝে শিশুর মত কেঁদে উঠতেন। তখন বাধ্য হয়ে মিসালিনাকে আসতে হত তাঁর কাছে, সেই অবুঝ বয়স্ক শিশুটিকে ভোলাতে হত নানা ছলাকলায়। তাঁর সমস্ত শরীর যদিও ঘিন ঘিন করে উঠত তখন তবু দাঁতে দাঁত চেপে থাকতেন মিসালিনা। আর এইভাবেই একদিন জন্ম হয়েছিল ব্রিটানিকাসের। মিসালিনা জননী হয়েছিলেন।

সন্তানের জন্মের পর থেকে মিসালিনা যেন আরো উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। শরীরের বাসনার সঙ্গে এসে মিশল ক্ষমতা লোভের বাসনা। এক ভোজসভার আসরে উন্মত্তের মত যেন নিজেকে শুনিয়েই বলে উঠলেন তিনি :

'আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, সবচেয়ে সুন্দরী এবং সবচেয়ে ভয়ংকর মহিলা হতে চাই।'

সেই দাম্ভিক ঘোষণার পর থেকে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে মাথা গলাতে সুরু করলেন। বহুমূল্য সব উপহারের পরিবর্তে তিনি ক্লডিয়াসকে দিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে লাগলেন, নিরপরাধ লোকদের ধরে ধরে নির্বাসন দণ্ড দেওয়ালেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সরকারী বিধিব্যবস্থা শিথিল করে দিলেন নতুন নতুন সব বেআইনী কর বসল, আর খুব অল্প দিনের মধ্যে রাজ্যের তাবৎ প্রজারা জেনে গেল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হলেন মিসালিনা। তার অঙ্গুলি হেলনে রোম সম্রাটের রাজ্যে সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মিসালিনার সাজানো দলিলে সই করতে অস্বীকার করতেন ক্লডিয়াস। বাধা দিতে চাইতেন মিসালিনার প্রবর্তিত সব বেআইনী করের ব্যাপারে। তখন মিসালিনাকে নতুন সজ্জায় সেজে আসতে হত তাঁর সামনে, লুকোচুরি খেলা খেলতে হত তার সঙ্গে কয়েকবার. নতুন ধরনের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করতে হত। ক্লডিয়াসের চারপাশে এক মায়াজাল বিস্তার করে নিজের হাতে পান পাত্রে উত্তেজক মদ ঢেলে পাত্রটি তার মুখের সামনে তুলে ধরতেন মিসালিনা তখন। তারপর কয়েকটা দিন সেই চটুলা ছলনাময়ী স্থির-যৌবনা নারী সবক্ষণ ক্লডিয়াসের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকতেন। এরপর যদিও সম্রাটের মনের সব বাধা বিপত্তি কেটে যেত অত্যন্ত সহজে, তিনি মোহাবিষ্টের মত মিসালিনার নির্দিষ্ট পথে পা ফেলতেন ; দলিলে সই করতেন, নতুন সব বেআইনী করের জন্য সনদ পাঠাতেন।

মিসালিনার তখন সব কাজ ফুরিয়ে যেত আবার সেই গোপন উন্মত্ত জীবনযাত্রায় ফিরে যেতেন তিনি। বার বার ডেকে ডেকেও আর মিসালিনার সাড়া পেতেন না ক্লডিয়াস।

ক্ষমতাশালী হওয়া ছাড়াও অন্য একটি ব্যাপারে ভীষণ অসহিষ্ণু ছিলেন তিনি। রাজ্যের কোনো প্রেমপূর্ণ নারীকেই সহ্য করতে পারতেন না মিসালিনা। ক্ষিপ্তের মত তিনি তাঁর সুখ শান্তি নষ্ট করে দিতেন। স্বপ্নেও তার পক্ষে ভাবা অসম্ভব ছিল যে, অন্য কোনো নারী পুরুষকে তার চেয়ে বেশী সুখ-শান্তি বা প্রেম দিতে পারে। এ ব্যাপারে একজন দাসীর সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে তার কুণ্ঠা ছিল না। 'রাজ্যের সমস্ত পুরুষকে আমার চাই।' 'পুরুষ মাত্রই আমার ক্রীতদাস,' দম্ভ ভরে বলতেন মিসালিনা। আর এই ভয়ংকর চাওয়ায় তার এক মুহূর্তের জন্যও অবসাদ আসত না, তার শরীরে একটুও ক্লান্তি দেখা যেত না কখনও, বরং তার প্রেমিকের সংখ্যা যত বাড়ত, ততই উল্লাসিত হয়ে উঠতেন মিসালিনা। আর মনোমত পুরুষ হলেই তাকে তার সমস্ত নির্দেশ মেনে চলতে হবে, এই ছিল তার অলিখিত আইন। তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতাও ছিল না রাজ্যের কোনো পুরুষ মানুষের। কারণ, বিনা বিচারে বেআইনীভাবে যখন-তখন, যে কোনো কারণেই মৃত্যুদণ্ডের বা নির্বাসনের ভয় ছিল তাদের। অতএব বাধ্য হয়েই তাদের এই ভয়ংকর রমণীটির কাছে ধরা দিতে হত, যোগ দিতে হত তার আসরে শারিরীক শুচিতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্লজ্জ হয়ে উঠতে হত।

অবশেষে ক্ষেপে উন্মত্ত হয়ে শোনা যায়, রাজ্যের সমস্ত বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীই মিসালিনার বিরুদ্ধে, তাকে হত্যা করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা দল গঠন করেছিল। কিন্তু এই ক্ষমতাশালী রমণীটির কেশাগ্রও তারা স্পর্শ করতে পারে নি কোনোদিন। কারণ, সবক্ষণ মিসালিনাকে ঘিরে থাকত যে অনুরক্ত পুরুষ শ্রেণী, তারা ছিল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত, ভয়ংকর শ্রেণীর লোক। অসম্ভব ছিল

তাদের দৈহিক শক্তি, বড় তীক্ষ্ণ ছিল তাদের দৃষ্টি, আর মিসালিনাকে তারা নিজেদের প্রাণের অধিক ভালোবাসত। শোনা যায়, তারা নাকি সবক্ষণ কুকুরের মত মিসালিনার পদতলে লুটিয়ে থাকত। কৌতুক করে মিসালিনাও নাকি তাদের সঙ্গে কুকুরীর মত আচরণ করতেন। অতএব কোনো ভাড়াটে হত্যাকারীর পক্ষে তাকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না রাজ্যে।

আর রাজ্যের মধ্যে একটি চালু গুজব ছিল, মিসালিনা নাকি কোন্ এক দেবীর কাছ থেকে পুরুষ বশ করার অলৌকিক মন্ত্র পেয়েছেন। সেই মন্ত্র নাকি একমাত্র পুত্র ব্যতীত সকল পুরুষের উপরই সমান কার্যকারী। ফলে রাজ্যের লোকদের তার প্রতি ভয়মিশ্রিত এক শ্রদ্ধাও ছিল। অতএব ক্লডিয়াসের সাম্রাজ্যে বাস করে মিসালিনার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, এই কথাটি প্রায় পৃথিবীর চিরন্তন সত্যগুলির মত অপর একটি সত্য হিসাবে চালু হয়ে গিয়েছিল তখন। সকলেই কথাটিকে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেও দ্বিধা করত না।

কিন্তু অসম্ভব একদিন সম্ভব হল। রাজ্যের সমস্ত মানুষের বিশ্বাস ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে নির্ভীক ভাষায় সম্রাটের শাসনের, অসাধু ব্যবসায়ীদের অত্যাচার অনাচারের প্রতিবাদ করে বসলেন ক্যায়াস সিলিয়াস নামে এক রূপবান, বুদ্ধিমান, স্বদেশপ্রেমিক যুবক সেনেটের সভায়। ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত অনাচার অত্যাচারের সব ভয়ংকর কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করে গেলেন তিনি। সেনেটের সভ্যরা বিস্মিত হলেন, আতঙ্কিত হয়ে তারা সিলিয়াসের পরিণামের কথা চিন্তা করে মনে মনে শিউরে উঠলেন। কারণ সিলিয়াস ছিলেন সকলেরই প্রিয়পাত্র। ঐ আশ্চর্য রূপবান, স্বদেশপ্রেমিক যুবকটির তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা। কেউ কেউ গোপনে ডেকে সাবধান করে দিলেন তাঁকে। কিন্তু সিলিয়াস তাতে ভয় পেলেন না, অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের দুর্দশায় তিনি ব্যথিত হয়ে উঠেছেন।

ক্ষিপ্তের মত তিনি কেবল রাজ্যের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে লাগলেন।

যথাসময় মিসালিনার কানে পৌঁছুল সব। প্রথম দিকে তিনি উপেক্ষা করলেন, পরে সিলিয়াস তাঁর অন্যায় আচরণের প্রতি ইংগিত করেও যখন সেনেটের সভায় বক্তৃতা দিলেন, তখন যুবকটির প্রতি সামান্য কৌতূহল জাগল তাঁর। আর একদিন সমুদ্রের বালুবেলায় সিলিয়াসের মুখোমুখি হলেন মিসালিনা। সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় মিসালিনা তাঁর সামনে দেখলেন দেবতার মত রূপবান এক তন্ময় তরুণ যুবাপুরুষকে। মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ড এক অজানা আবেগে দুলে উঠল, এক নতুন উন্মাদনা অনুভব করলেন তিনি নিজের ভেতর। ইতিপূর্বে কয়েক শ' পুরুষ ঘেঁটে দেখেছেন মিসালিনা, কিন্তু কখনই তো তাঁর এজাতীয় অনুভূতি হয় নি। মনে মনে বিস্মিত হলেন তিনি। এতক্ষণ প্রস্তরের মত বালুকাবেলায় প্রোথিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন. সংবিৎ ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে লক্ষ করলেন, যুবাপুরুষটিও স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথম কোন পুরুষের দৃষ্টিপাতে তিনি নারীত্বের স্বাভাবিক লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলেন, স্বাভাবিকভাবেই তার চোখের সলজ্জ পলক দুটো নেমে এলো। একমুহূর্তও আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না মিসালিনা। লাজুক নবীনার মত দ্রুত স্থানত্যাগ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সিলিয়াসেরও সংবিৎ ফিরে এল। এতক্ষণ তিনি যেন জ্ঞানহারানের মত এক অপরূপা নারীকে দৃষ্টির সম্মুখে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছিলেন। ঈষদমুক্ত ওষ্ঠাধর, নিশ্চল চক্ষুতারকা, স্তনপট্ট অল্প স্খলিত; এক অপরূপা নারীমূর্তিকে তিনি তার দৃষ্টির আন্তরিক বিস্ময় দিয়েই স্থিরভাবে লক্ষ করছিলেন। যেন নারী নয়, এক বহ্নিকে তিনি দু-চোখ ভরে দেখছিলেন এতক্ষণ। এক অস্থির মন নিয়ে সেদিন নিজের বাড়িতে ফিরলেন ক্যুয়াস সিলিয়াস।

আর সেই কয়েক মুহূর্তের দর্শনে এক বিপ্লব ঘটাল মিসালিনার মনে। তাঁর এই দীর্ঘকালীন উত্তেজক জীবনযাত্রা এই প্রথম একান্তই কলুষিত বলে মনে হল। একে একে তাঁর সমস্ত প্রিয়পাত্র নাগরদের চোখের সামনে থেকে দূর করে দিলেন, রাতারাতি গোপন আসরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই যেন আমূল পালটে গেলেন তিনি। জীবনে যেন এক নতুন সূর্যোদয় হল তাঁর। রাজ্যের সমস্ত বেআইনি করের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলেন, ক্লডিয়াসকে দিয়ে সরকারী সমস্ত অত্যাচার অনাচারের নীতিকে পরিবর্তন করালেন। যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ হয়ে উঠলেন মিসালিনা। সলজ্জ কোমল শান্ত স্বভাব হল তাঁর, মুখের ভাষা মসৃণ মৃদু হয়ে গেল, চাল-চলনে এল এক কুণ্ঠিত জড়িমা। আশ্চর্য, জীবনে এই প্রথম সিলিয়াসের প্রেমে পড়লেন মিসালিনা প্রেতিনীর মত নয়, এক নবীনা প্রেমিকার মত তিনি এই প্রথম প্রেম ভিক্ষা করলেন একটি পুরুষের কাছে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই রানীর কাছ থেকে প্রেমের উপঢৌকন পেলেন সিলিয়াস। প্রথম ভেবেছিলেন ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ অনুসারে তিনি সেগুলো গ্রহণ করলেন। কিঞ্চিৎ ভীতও হয়ে উঠলেন মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন নগর থেকে দূরে, রাজ্যের এক নির্জন স্থানে

আর একদিন মিসালিনা এলেন তার প্রেমিক পুরুষের কাছে প্রতি পদে পদে তিনি এক কিশোরীর মত লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলেন, তার সলজ্জ চোখের পলক দুটি নত হয়ে রইল সব সময়, মৃদু অস্ফুট স্বরে তিনি যেন সংগীতের ভাষায় বন্দনা করলেন প্রেমিককে

মুগ্ধ হলেন সিলিয়াস। কিন্তু রানীর সম্বন্ধে তার মনের ভীতি কাটল না প্রথমে। প্রেমিকের মত নয়, একজন বন্ধুর মত আচরণ করলেন তিনি মিসালিনার সঙ্গে। আহত, ক্ষুব্ধ হলেন মিসালিনা। গোপনে একবার অশ্রুবর্ষণ করতেও দেখা গেল তাকে। কীভাবে যে

সিলিয়াসের প্রেম পাবেন, তিনি ভেবে পেলেন না কিছুতে! আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠে পূর্বের উগ্রমূর্তিতে ফিরে গেলেন মিসালিনা।

ফলে একদিন সমস্ত রোমের নগরবাসী দেখল মিসালিনার এক নতুন অভিসার যাত্রা। সমস্ত পথ জুড়ে রানীর দাসদাসী চলল আগে আগে, মাঝখানে এক সুন্দর কারুকার্যময় রথে দর্পিতার মত বসে তিনি। কয়েক হাজার দেহরক্ষী সৈন্য নিয়ে শোভাযাত্রা করে সিলিয়াসের বাড়িতে গিয়ে পৌছুলেন মিসালিনা। জীবনে এই প্রথম সকলকে জানিয়ে, সমারোহ করে অভিসার যাত্রা করলেন তিনি। মিসালিনার এই দুঃসাহসিক স্পর্ধায় সকলে বিস্মিত হল, তাঁর নির্লজ্জ আচরণে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাদের ওষ্ঠ, কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না। তারা এ কথা বুঝতে পেরে আনন্দিত হল যে, মিসালিনার দিন ঘনিয়ে এসেছে যতই নির্বোধ, হাবাগোবা স্বভাবের হোন ক্লডিয়াস, কিন্তু তিনি তো একজন পুরুষ, স্ত্রীর এই নির্লজ্জ স্বৈরাচার কিছুতেই আর সহ্য করবেন না।

অন্য দিকে ভীতবিহ্বল সিলিয়াসও রানীর প্রেমে ধরা দিতে আর দ্বিরুক্তি করলেন না। বরং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মিসালিনার সৌন্দর্য তাঁর প্রেমিক অন্তরটিকে আলোড়িত করে দিল। এক উন্মত্ত প্রেমিকের মত তিনি প্রেমিকার বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। তারপর তাঁদের দিনরাত্রিগুলো হয়ে উঠল স্বপ্নময়। একদা নির্ভীক স্বদেশ-প্রেমিক স্বাধীনচেতা সিলিয়াস ক্রমশ যেন বদলে যেতে শুরু করলেন। তার স্বভাবের সৎগুণগুলো যেন লোপ পেতে লাগল। তিনি এমনকি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, সমস্ত পৃথিবীর অধিশ্বরী হয়ে বসেছেন মিসালিনা আর তিনি তাঁর প্রেমিক-পুরুষ হয়ে গৌরবময় জীবন কাটাচ্ছেন। দুজনে যৌথভাবে তারা সেই সময় সম্রাট ক্লডিয়াসকে হত্যা করার এক ফন্দি পর্যন্ত ছকে ফেললেন। ঠিক হল, এক ভোজসভায় ক্লডিয়াসের মদের পাত্রে মারাত্মক ধরনের বিষ মিশিয়ে দেবেন মিসালিনা। আর সেই বিষ সিলিয়াস প্রাচ্য দেশীয় এক

পরিচিত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনে দেবেন। যদি এই ফন্দিটা কার্যকারী না হয়, তা হলে এক প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়ে সাঁতার-না-জানা সম্রাটকে মিসালিনা সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেবেন আর সিলিয়াস মাঝি-মল্লাদের ঘুষ খাইয়ে মুখ বন্ধ করবেন।

প্রেমে যতটা না বেশী পাগল হলেন মিসালিনা, তার চেয়ে বেশী হল সিলিয়াস। তিনি উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠলেন। পরিপূর্ণভাবে মিসালিনাকে পাওয়ার আশায় একরকম নকল বিয়ের অনুষ্ঠানও করতে হল তাঁকে। জ্ঞানহারা হয়ে তিনি এ কথাটিও ভুলে গেলেন যে, অন্যের বিবাহিত পত্নীকে স্বামীর বর্তমানে বিবাহ করা গর্হিত কর্ম বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। সমস্ত কিছু জেনে শুনেও তিনি যেন অন্ধ হয়ে রইলেন। এই সময় মিসালিনাও তার সহজাত জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এদিকে সিলিয়াস আর মিসালিনার উন্মত্ত প্রেম-উপাখ্যান ক্লডিয়াসের কানে গিয়ে পৌঁছতে লাগল। এক-এক সময় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, কিন্তু মিসালিনা এসে তাকে অন্য কথা বোঝাতেন। তিনি আবার শান্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু বেশিদিন আর মিসালিনার এই লুকোচুরি চলল না। কয়েক দিনের বিশ্রাম নেবার ছলে তিনি সিলিয়াসকে নিয়ে সম্রাটের এক প্রমোদ-ভবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন রাজধানী থেকে বহু দূরে এক নিরালা নির্জন সমুদ্রতীরে। আর সেই সুযোগে মিসালিনার শত্রুপক্ষ সম্রাটের কানে মন্ত্র দিল। মিসালিনাকে যদি তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে ধরতে হয় হাতে নাতে, তা হলে এই হল প্রকৃষ্ট সময়; এমন সুযোগ আর কখনও পাওয়া যাবে না। সব কথা শুনে ক্লডিয়াস ফিক্ করে হেসে উঠলেন। ঘটনাকে তাঁর এক ধরনের লুকোচুরির খেলার মতই উত্তেজক আনন্দদায়ক বলে মনে হল। কোনো দ্বিধা না করেই তিনি রথে উঠে বসলেন একদল সৈন্যের সঙ্গে

তারপর নগর প্রান্তর পেরিয়ে সম্রাটের রথ গিয়ে পৌঁছল সেই প্রমোদ-ভবনের দরজায়। ঘটনাটা ঘটল এত অতর্কিতে যে, প্রেমিক-

প্রেমিকা নিজেদেব লুকিয়ে ফেলবাব পর্যন্ত সময পেলেন না। আতঙ্কিত হযে তাবা কেবল প্রমোদ-ভবনেব বিশাল দবজাটা বন্ধ কবে দিয়ে আত্মগোপন কবলেন। কিন্তু অল্প সময়েব মধ্যেই প্রমোদ-ভবনেব দবজাটা ভেঙে পড়ল সম্রাটেব সৈন্যবাহিনীব পদাঘাতে। লুকোচুরি খেলাব আনন্দ উপভোগ কবতে কবতে ক্লডিয়াস হাস্যোৎফুল্লমুখে ঢুকলেন প্রাসাদেব ভিতবে। কিন্তু হতাশ হলেন তিনি, প্রাসাদেব ভিতব সিলিযাসকেই কেবল পাওযা গেল অর্ধউলঙ্গ অবস্থায। সে ভীত আতঙ্কিত হযে সম্রাটেব সামনে নতজানু হযে বসে একে একে তাব সমস্ত পাপেব স্বীকাবোক্তি কবে গেল। সিলিযাসেব বক্তব্য শুনতে শুনতে ক্রোধে বক্তিম হযে উঠল ক্লডিযাসেব মুখ। প্রহবীদেব ডেকে তিনি তাকে প্রাণদণ্ডেব আদেশ দিলেন। প্রহবীবা মৃতপ্রায সিলিযাসকে সম্রাটেব সম্মুখ থেকে টেনে নিযে গেল। শূন্য ঘবে অনেকক্ষণ ধবে অস্থিবভাবে পাযচাবি কবে বেড়াতে লাগলেন ক্লডিযাস। আব ঠিক সেই মুহূর্তেই উৎফুল্ল সৈন্যদল মেসালিনাকে সমুদ্রেব ধাবেব অবণ্যে আত্মগোপন কবে থাকতে দেখে ধবে বেঁধে নিয়ে এসে ঘবে ঢুকল। এক মুহূর্ত স্থিব হযে ক্লডিযাস এক পলক দেখলেন মেসালিনাকে। তাবপব অত্যন্ত ধীব শান্ত গম্ভীব স্ববে প্রহবীদেব নাবকুসেব বনে গুপ্ত প্রাসাদে মেসালিনাকে বন্দী কবে বাখবাব আদেশ দিযেই অন্য দিকে চোখ ফিবিযে নিলেন। মেসালিনা স্বামীব এই অদ্ভুত অচেনা গলাব স্ববে একবাব চোখ তুলে তাকালেন। কেমন অদ্ভুত বযস্ক আব গাম্ভীর্যপূর্ণ দেখাচ্ছে ক্লডিযাসকে। মনে মনে ভাবলেন একবাব, তাবপব দৃপ্ত বাজকীয ভঙ্গীতে প্রহবীদেব অনুসবণ কবে ঘব থেকে বেবিয়ে গেলেন।

কযেক মুহূর্তেব জন্য অদ্ভুত পবিবর্তিত হযে আবাব স্ব-মূর্তিতে ফিবে গেলেন ক্লডিযাস। নাবালক শিশুব মত কেঁদে উঠলেন। দীর্ঘদিন পবে আবাব বোমেব কুমাবী বা বিবাহিত নাবীব দল প্রাণ খুলে হেসে উঠল। স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলল সাধাবণ মানুষেব দল। সিলিযাসেব

মত একদা স্বাধীনচেতা, নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক যুবকটির জন্য কোনে কোনো বয়স্ক সেনেটার গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

আর দীর্ঘদিন ধরে মিসালিনার গোপন প্রেমিক অপরাধীদের বিচার চলল। বিচারে তিন শ' পঁয়ষট্টি জন প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল।

এরপর ক্লডিয়াসের কাছ থেকে এক গোপন দূত গেল একদিন মিসালিনার সেই নির্জন বন্দী শিবিরে। সে গিয়ে প্রস্তাব করল সর্বসমক্ষে সম্রাটের কাছে যদি মার্জনা ভিক্ষা করেন মিসালিনা তা হলে মুক্তি পাবেন।

বক্তব্যটি শুনে সম্রাটের সেই গোপন দূতটির দিকে ভ্রূকুটি করে তাকালেন মিসালিনা, তারপর গর্বিত স্বরে বললেন—

'মার্জনা ভিক্ষা চাইব আমি, ঐ গর্দভটার কাছে? যাও যাও কথাটি শেষ করে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আর সেইদিন সন্ধ্যায় একজন সরকারী ঘাতক এসে পৌঁছুল মিসালিনার প্রাসাদে। এক পলক তার দিকে তাকিয়েই দ্রুত একটি ছোরা বের করে আনলেন মিসালিনা তাঁর ঝলমলে পোশাকের ভিতর থেকে। তারপর প্রাণপণে নিজের বুকের উপর ছোরাটাকে বিদ্ধ করে দিতে গেলেন কিন্তু চকিতেই তার হাত থরথর করে কেঁপে উঠল ভারী একটি শব্দ করে ছোরাটি মেঝের উপর পড়ে গেল। আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ঘাতকের খড়্গ দেহ থেকে মিসালিনার রমণীয় মস্তকটি ছিন্ন করে দিল।

কোনো রাজকীয় সমারোহ হল না তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। সমস্ত সরকারী দলিল-দস্তাবেজ থেকে তার নামটি ঘষে ঘষে মুছে ফেলা হল। তাঁর সকল মূর্তি বা চিত্র সমুদ্রের গর্ভে বিসর্জন দেওয়া হল একদিন রোমান ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল একজন চটুল, ছলনাময়ী রতি-রস-চাতুরা নারীর নাম।




# কেন ভালোবাসা

১৭৭৯ সালের এক সকালে ইংলণ্ডের জাহাজঘাটায় এসে নামলেন প্যারিসের ব্রিটিশ অ্যামব্যাসির উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ নাথানিয়াল কার্থ। সরকারীভাবে কেউ তাকে জাহাজঘাটায় স্বাগত জানাতে এল না। যদিও আসার কথাও ছিল না কারো। কাউকে সংবাদ না দিয়েই এবারে এসেছেন তিনি। এসেছেন এমন একটা কাজের ভার নিয়ে যেটা একান্তই গোপনীয়। মুখ ফুটে বলা যাবে না কাউকে।

কুয়াশাচ্ছন্ন জাহাজঘাটা থেকে দ্রুত পা ফেলে তিনি মিশে গেলেন পাঁচমিশালী জনতার ভিড়ে। বলা যায় না কখন কোনো চেনা লোকের পাল্লায় পড়ে যান। দেখা হলেই তো নানা প্রশ্ন নানা কৈফিয়ৎ। হঠাৎ অসময়ে তার ইংলণ্ডে আসার উদ্দেশ্যটা বা কি? জানতে চাইলে কিছুই বলতে পারবেন না তিনি। হয়ত দু' একটা বানানো গল্প বলবেন; কিন্তু তাঁর আগমনের সংবাদটা চাউর হয়ে যাবে।

ভোজসভা আর দেখাশোনার পালা বসে যাবে। খুব সহজে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন না। ফলে তার আসল কাজে বাধা পড়বে।

দ্রুত পায়ে জাহাজঘাটা পেরিয়ে হেঁটে আসতে আসতে এই সব কথা ভাবলেন মিঃ ফোর্থ। একবার আগমনের আসল উদ্দেশ্যের ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিলেন মনে মনে; এক রূপসী ইংরেজ বালিকাকে খুঁজে বের করতে হবে তাকে বালিকাটি আবার যেমন তেমন হলে চলবে না, মেয়েটিকে রূপসী হতে হবে, আবার বুদ্ধিমতী ও মোটামুটি ভাল ঘরের হওয়া দরকার 'দেখবেন যেন কোন অসুখ বিসুখ না থাকে তার'—অরল্যান্সের ডাচেসের কথাটি মনে পড়ল। তেমন মনোমত কাউকে পাওয়া গেলে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে হবে প্যারিসে বালিকাটি অরল্যান্সের ডিউক আর ডাচেসের পুত্রকন্যার ইংরাজী জানা সঙ্গী হিসাবে প্যালিয়াস রয়ালে অসম্ভব ঐশ্বর্যের মধ্যে বসবাস করবে।

মনে পড়ল তার প্রস্তাবটা প্রথম শুনে তিনি বার বার মাথা নেড়েছিলেন। কাজটা প্রায় অসম্ভব কোন মা-বাবা তাদের মেয়েকে ছেড়ে দেবে এই শর্তে? খানদানী ক্ষমতাশালী পরিবারে শিশুদের সঙ্গী হিসাবে যাকে থাকতে হবে বছরের পর বছর, কখনও আর সে বাড়ি ফিরতে পারবে না। কোন বাবা-মাকেই বা এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শোনাবেন তিনি। আর কে-ই বা রাজি হবে বহুভাবে তিনি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন প্রস্তাবটাকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বলেছেন বারবার কিন্তু ঐ পাগলা ডাচেস গোঁ ধরে বসলেন এই ধরনের একটি বালিকাকে তার চাই-চাই আর এদিকে এই ক্ষমতাশালী পরিবারটিকে চটাতে সাহস হল না। নাথানিয়াল ফোর্থের অতএব খুঁজতে বেরুলেন একটি রূপসী, বুদ্ধিমতী সদ্বংশ-জাত বালিকা দাসীকে।

তারপর কয়েকটা দিন ফোর্থের কাটল পাগলের মত এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে। গা ঢাকা দিয়ে অত্যন্ত গোপনে ঘোরাফেরা করতে হচ্ছিল

তাঁকে। প্রথমে খোঁজা শুরু করলেন লণ্ডনের বস্তী অঞ্চল থেকে গরীব দুঃখীদের পাড়া থেকে; তারপর মধ্যবিত্ত পাড়াগুলোও খুঁজে খুঁজে দেখলেন। সকালে কোন রকমে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোন আর ফিরতে ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়। বাড়ি ফিরেও লুকিয়ে থাকতে হয় তাকে কোনো কোনো দিন ঘুরতে ঘুরতে চলে যান গ্রামাঞ্চলের দিকে। সবে গ্রীষ্ম শুরু হয়েছে, হাওয়ায় কিঞ্চিৎ উষ্ণতার আমেজ পাওয়া যায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক গ্রামাঞ্চলে নদীর ধারে সন্ধ্যার মুখে এক অপরূপ বালিকাকে খেলা করে বেড়াতে দেখলেন তিনি। সেদিন শহরে ফেরবার পথে বালিকাটির খোঁজ খবর নিলেন ভালো করে, তারপর পরদিন ভোরবেলায় সোজা এসে হাজির হলেন মেয়েটির বাড়িতে। দরজায় টোকা দিতেই মেয়েটির মা বেরিয়ে এলেন। অনেক কথাবার্তা বললেন মিঃ নাথানিয়াল ফোর্থ তাঁর সঙ্গে। একে একে সমস্ত কিছু জেনে নিলেন তিনি। ভদ্রমহিলার স্বামী একজন নাবিক, দীর্ঘকাল তাঁর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। আগে তাঁরা শহরে মধ্যবিত্ত পাড়ায় থাকতেন, স্বামীটি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন দূর থেকে। তারপর কয়েক বছর হল আর তাঁর খোঁজ খবর পান না ভদ্রমহিলাটি, টাকা পয়সা আসাও বন্ধ হয়ে গেছে অগত্যা তিনি মেয়েকে নিয়ে গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছেন। মন দিয়ে ভদ্রমহিলার দুঃখের কাহিনী শুনলেন ফোর্থ, তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে প্রস্তাবটি পেশ করলেন তাঁর কাছে। দিনের পর দিন ভদ্রমহিলার কাছে কন্যার সম্ভাব্য সুখ স্বাচ্ছন্দের বর্ণনা দিলেন নাথানিয়াল। ভদ্রমহিলাটিও আর মুখফুটে না বলতে পারলেন না। দরদামও ঠিক হয়ে গেল। তারপর একদিন কুড়ি গিনির পরিবর্তে ঐ অপরূপ রূপসী বালিকাটিকে কিনে নিয়ে ফোর্থ ইংলণ্ডের জাহাজঘাটায় এলেন। আর একদিন নাথানিয়াল ফোর্থের চিঠি সমেত ঐ সোনালী চুলের রূপসীটি বিদেশে চালান হয়ে গেল। চিঠিতে মিঃ ফোর্থ লিখলেন—

'ইংলণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী বালিকাটিকে আমি আপনাদের

কাছে পাঠাচ্ছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস একে আপনাদের পছন্দ হবে।'

নাথানিয়াল ফোর্থের চিঠি সমেত পামেলা সিম্‌স যখন গিয়ে পালিয়াস রয়েলের দরজায় দাঁড়াল তখন অরল্যান্সের ডিউক বা ডাচেসের মুখে কোন কথা ফুটল না। তাঁরা কেবল স্তম্ভিত হয়ে ঐ অপরূপ রূপসী বালিকাটিকে নির্নিমেষ নয়নে দেখতে লাগলেন। 'এমন রূপ চোখে দেখা যায় না সচরাচর' ফিস্‌ফিস্‌ করে ডিউকের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন ডাচেস।

আর তারপর থেকে পামেলার জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। জীবনে এত ঐশ্বর্য সে দেখেনি কোনোদিন, এমন পোষাক পরিচ্ছদ এমন লোকজন, বাড়িঘর। যেন সব স্বপ্ন মনে হল তার প্রথম। এতদিন সে এইসব ঐশ্বর্যের কথা রূপকথার বইতেই পড়ে এসেছে, নিজের চারপাশে যে এতসব দেখবে তা কোনদিন ভাবতে পারেনি সে অতএব সবকিছুকে পামেলার স্বপ্নের মত মনে হল। তারপর আস্তে আস্তে সেই স্বপ্নময় পরিবেশে দিন কাটতে লাগল তার। মাদাম দি জিনেলিস নামে একজন গভর্নেস রাখা হল কেবলমাত্র তারই জন্য। একজন রাজকন্যার মত জীবন কাটাতে লাগলেন তিনি। ডিউক তাকে মাসে মাসে একটা মোটা টাকার অংক মাইনে হিসাবে দিতেন। দামী দামী পোষাক পরিচ্ছদ আসত তার জন্য। কাজের মধ্যে ছিল সমবয়সী বা ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে সারাদিন খেলা করে বেড়ান কিছু কিছু লেখাপড়া, সেলাইফোঁড়াই শেখা। নাচ গান পিয়ানো বাজনা শেখানোর জন্য আলাদা শিক্ষিকা ছিল তাঁদের। নতুন পরিবেশে ক্রমশ পামেলার মন থেকে আগের জীবনের ভয়াবহ দুঃখ দারিদ্র্যের ছবিগুলো মুছে গেল, এমনকি একদিন নিজের মার কথাও একদম ভুলে গেলেন তিনি।

আর এদিকে যত দিন যেতে লাগল, পামেলার রূপ ফেটে পড়তে লাগল তত। তারপর সুদীর্ঘ বারো বছর পর পামেলা স্বদেশে অর্থাৎ

লণ্ডনে একবার বেড়াতে এলো। তাঁর রূপে চমকে উঠল লণ্ডনের উঁচুতলার সমাজ। সাড়া পড়ে গেল যুবক সমাজের মধ্যে, বয়স্করাও বাদ গেলেন না। পাগলাটে চিত্রকর রোমনি তাঁর দুখানা ছবি আঁকলেন, বিখ্যাত নাট্যকার সেরিডন নতজানু হয়ে বসলেন পামেলার পায়ের কাছে। শোনা যায় সেরিডনের এমন উন্মাদ অবস্থা হয়েছিল যে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে পামেলার ঘরের সামনে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে দেখা যেত। দিনরাত্রি তাঁর মুখে পামেলার নাম ছাড়া অন্য কোন নাম শোনা যেত না তখন। মাস কয়েকের জন্য নাটক রচনাও ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিদিন ভোর বেলায় সেরিডনের চিঠি আর ফুলের তোড়া নিয়ে দূত আসত পামেলার কাছে। শোনা যায় সেইসব ছোটো ছোটো চিঠিগুলো সাহিত্য হিসাবেও ছিল অতুলনীয়। পামেলা কিন্তু সেরিডনের উন্মত্ততায় নীরবে হাসতেন। আর শেষ পর্যন্ত সেরিডন যখন বিবাহের প্রস্তাব করলেন একদিন তখন পামেলাকে মুখ ফুটে 'না' বলতে হল। সকলে হি হি করে উঠল পামেলার সুমতি দেখে। অনেকে আবার একথাও বলে বেড়াতে লাগল—সৌন্দর্য ছাড়া পামেলা সিম্সের আর কিছু নেই। হৃদয় বা মস্তিষ্ক বলে কোন পদার্থই নেই তাঁর। উত্তরে কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না পামেলা। কিছুতেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ সখিদের বোঝাতে পারলেন না যে তিনি কত অসহায়। বহুবার চেষ্টা করেও তিনি কিছুতেই সেরিডনের প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নি, কারণ সেরিডনকে কখনই প্রেমিক পুরুষ বলে মনে হয়নি তাঁর। সেরিডনের উপস্থিতিতে তাঁর মন বা শরীরে কোন সাড়াই জাগে নি কখনো। আর মনের সাড়া না পেলে তিনি কি করে বিবাহের প্রস্তাবে রাজী হবেন। প্রেমিক পুরুষ হিসাবে যাকে তিনি এতদিন কুমারী কল্পনায় লালন করে এসেছেন তিনি আর যেই হোন সেরিডন নন।

এক মানসিক অবসাদ, শূন্যতা নিয়ে পামেলা সিম্স ফিরে এলেন প্যারিসে। ইংলণ্ডের সফর তাঁর মনে এক প্রেমের ক্ষুধা জাগিয়ে

দিয়েছে। পামেলা অধীর হয়ে তাঁর সেই অদেখা প্রেমিক পুরুষ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন সর্বক্ষণ। আর ঠিক যেন সময় বুঝে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল পামেলার জীবনে। অন্তরঙ্গ এক সঙ্গীর সঙ্গে একটা জমজমাট নাটক দেখতে গেছেন সেদিন সন্ধ্যেবেলা। থিয়েটার হলে পৌঁছেছেন একটু আগে আগেই। নির্দিষ্ট বক্সে বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন হলের ভিতর। আর, একসময়ে দৃষ্টিটা তাঁর ঘুরে ঘুরে গিয়ে পড়ল দূরের একটা বক্সে, একজন তরুণের মুখের উপর। স্তব্ধ হয়ে গেলেন পামেলা। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন দুলে উঠল আচমকা, যেন শুনতে পেলেন একটা সোনার ঘণ্টা বুকের ভেতর বেজে উঠল গভীর স্বরে। সমস্ত শরীরে এক রোমাঞ্চ অনুভব করলেন তিনি। দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে গিয়েও যেন পারলেন না। দুটি দৃষ্টি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। একসময় লাজুক চোখের পাতাদুটো নামিয়ে আনলেন পামেলা সিম্স। অযথাই এক উষ্ণতা অনুভব করলেন, রক্তিম হয়ে উঠল তার গালের রঙ। যুবা পুরুষটিও নিজের বক্সে বসে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। জীবনে বহু রূপসীকে দেখেছেন তিনি কিন্তু এমন অলৌকিক রূপ বুঝি কোনোদিন চোখে পড়েনি তাঁর কয়েক মুহূর্তে নিজের মানসিক অবস্থাটা অনুভব করলেন তিনি। এই উনত্রিশ বছরের জীবনে যা হয়নি তাই যেন হল লর্ড এডোয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের, কয়েক মুহূর্তের জন্য সাহসের অভাব দেখা দিল একবার নিজের জীবনটা মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখতে ইচ্ছে হল তার সাহস আর সৎ আদর্শবাদী পুরুষ হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছেন সমাজে, তার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এতকাল দু-দু বার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি, দেহে নিদারুণ সব অস্ত্রাঘাত নিয়ে, কিন্তু কখনই পিছিয়ে যাননি। অত্যন্ত গোপনে দেশব্যাপী যে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলেছে তারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্রাটের এক ভোজন সভায় নির্ভীক ভাবে সকলের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিবারের খেতাব সম্মান সম্রাটকে ফিরিয়ে নেবার

অনুরোধ জানিয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপে যায় নি, যখন তিনি ঘোষণা করেছেন অতঃপর তিনি পরিবারের ধাঁপা শূন্য খেতাবধারী অভিজাত না হয়ে নিজেকে ফরাসী দেশের একজন সাধারণ নাগরিক ফিটজজেরাল্ড বলেই মনে করবেন। সাধারণ জনতার মধ্যেই তিনি মিশে যেতে চান। উচ্চ অভিজাত সমাজের সঙ্গে কোন যোগাযোগই অতঃপর আর তিনি রাখতে চান না। এ ঘোষণার পর যে দেশব্যাপী এক তুমুল আলোড়ন উঠেছে অভিজাত সমাজের মানুষের। সৈন্য বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ভয়ানক রকমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এ খবরও অজ্ঞাত নেই তার। পার্লামেন্টে তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে একদিন। সে সংবাদও খবরের কাগজে কানে এসেছে তাঁর। যে কোন মুহূর্তেই তার উপর সম্রাটের শমন আসতে পারে কিংবা দোষে নিক্ষিপ্ত হতে পারেন কারাগারে—এ ও জানেন তিনি; তবুও সেদিন [illegible] কিন্তু আজ একজন [illegible] তা। একটা দ্বিধা সংকোচ এসে তাকে দুর্বল করে দিল। তারপর যতবার তিনি যুবতীটির দিকে তাকান ততবারই [illegible] বুকের মধ্যে রক্তের এক উন্মত্ত কল্লোলধ্বনি শুনতে পান। ফলে বেশীক্ষণ নিজেকে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি অলস দর্শক শ্রেণীর ভিড় দিয়ে অন্ধের মত ছুটে গেলেন সেই বক্সটির কাছে, তারপর দরজাটি খুলে পামেলা সিমসের সামনে নতজানু হয়ে বসলেন লর্ড এডোয়ার্ড ফিটজজেরাল্ড। তারপর ফিসফিস করে স্বপ্নিল কণ্ঠস্বরে উন্মাদের মত বলতে লাগলেন 'দয়া করুন পেসা। আপনাকে দেখার পর থেকে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। আমাকে আপনি বিবাহ করুন।' স্বপ্নাবিষ্টের মত পামেলা সিমসকে যে কী বললেন খেয়াল রইল না তার। আর পামেলার অসম্ভব সুখে ও আনন্দে মূর্ছিত হয়ে যাবার দশা হল। মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি। নির্দিষ্ট বক্সের ভেতর একটা অসম্ভব নাটক অভিনীত হতে দেখে, 'আপনি কী পাগল

হয়ে গেলেন, এ কী করছেন আপনি', হতচকিতের মত পামেলার সঙ্গীনী মাদাম দি জেনিলিশ বললেন উৎকণ্ঠিত গলায়।

সঙ্গীনীর কণ্ঠস্বরে যেন জ্ঞান ফিরে এল এডোয়ার্ডের। ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি। আরক্ত মুখে আর একটিও কথা না বলে নীরবে ঘর থেকে বেবিয়ে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে ঐ বিখ্যাত নাট্যশালার এক দামী বক্সের ভিতর এক অসম্ভব নাটক অভিনীত হয়ে গেল। আবেশে বিহ্বল পামেলা বক্সের সোফায় নিষ্প্রাণ পুতুলের মত বসে রইলেন তারপর। তাঁর কানে ঐ দীপ্ত রূপবান যুবা পুরুষটির কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াতে লাগল। মাদাম দি জেনিলিস কেবল মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ, একি ব্যবহার আজকালকার যুবক সমাজের। আলাপ নেই, পরিচয় নেই, কেবল পাগলের মত 'বিয়ে কর', 'আমায় বিয়ে কর' বললেই হল যত সব উন্মাদের কাণ্ড'। ভালো করে নিজের বক্তব্যটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, বক্সের দরজায় আবার টোকা দেবার শব্দ হল বাইরে থেকে।

'উঃ, জ্বালাতন করল দেখছি।'

রাগে চীৎকার করতে করতে গিয়ে মাদাম দি জেনিলিস উঠে দরজাট খুলে দিলেন। ভদ্র সভ্য ভাষায় একটা গালাগালিও মুখে এসেছিল তার। কিন্তু দরজাটা খুলেই তিনি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন দরজার সামনে অরল্যান্স পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বান্ধব হাস্যরসিক বৃদ্ধ লর্ড ডুনি দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পিছনে অবনত মস্তক সেই যুবকটি। অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বক্সের ভিতর ঢুকলেন লর্ড ডুনি, তারপর হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিলেন যুবকটিকে পামেলার সঙ্গে। আর একসময় দুজন আরক্ত হেঁট-মাথা যুবক-যুবতীর অলক্ষ্যে স্থান ত্যাগ করলেন ঐ রসিক বৃদ্ধটি। একসময় নত চোখের দৃষ্টিটা তুললেন এডোয়ার্ড তারপর শান্ত কোমল গলায় পামেলাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমার একটু আগের আচরণের জন্য আমি

দুঃখিত। আমি আপনার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি। আর সত্যি সত্যি আপনি আমাকে ক্ষমা করলেন কিনা তার প্রমাণ পাবো, কাল রাত্রে আপনি ও আপনার সঙ্গীনীটি যদি আমার সঙ্গে ডিনার খেতে রাজী হন।' কথাটা শেষ করে মৃদু একটু হাসলেন লর্ড এডোয়ার্ড ফিটজারেল্ড।

তারপর বড় দ্রুত যেন যুবক যুবতীটি পরস্পরের কাছে এলেন: আর সেই প্রথম দেখা হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁদের বিবাহের সব ঠিক্ঠাক হয়ে গেল।

সেণ্ট কইনটিন চার্চে ক্রীসমাসের এক সকালে তাদের বিয়ে হল। ফ্রান্সের সম্ভাব্য সম্রাট হয়েও হতভাগা লুইস ফিলিপ্পি তাঁদের বিবাহের একজন সাক্ষী হয়ে খাতায় সই করলেন। এরপর দিনগুলো তাঁদের যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে লাগল। এডোয়ার্ড তার নবপরিণীতা বধূটিকে তাঁর গ্রামের পৈতৃক প্রাসাদটি দেখানোর জন্য লণ্ডনের পথে যাত্রা করলেন। বন্ধুদের একজন ঠাট্টা করে এডোয়ার্ডকে বলল—

'ব্যাপার কী হে তোমার। তোমার তাড়াহুড়ো দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি আর মাত্র কয়েকটা দিন বেঁচে আছো। অতএব যত তাড়াতাড়ি পারো স্ত্রীকে সব দেখিয়ে দিচ্ছ।'

বন্ধুটির কথায় সবাই হেসে উঠল জোর গলায়। পামেলা কিন্তু হাসতে পারলেন না। হঠাৎ-ই তাঁর বুকটা যেন কেমন করে উঠল।

কিন্তু ডাবলিনের সেই ছোট্ট নির্জন ছবির মত প্রাসাদটায় পা দেওয়া মাত্র সব কিছু ভুলে গেলেন পামেলা। আনন্দে তাঁর গান করে উঠতে ইচ্ছে হল। চিঠিতে লিখলেন তিনি সঙ্গীনী মাদাম দি জেনিলিসকে: 'জীবনটাকে যেন এক রোমাঞ্চকর উত্তপ্ত স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে আমার: কোন নারী বোধ হয় আমার মত সুখী বা আনন্দিত হয়নি পৃথিবীতে। এক এক সময় আনন্দ এসে আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরে, তখন মনে হয় এত সুখ কী চিরদিন সইবে আমার।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুটি সুন্দর সন্তানের জননী হয়ে পামেলার

জীবন কানায় কানায় ভরে গেল জীবনের কাছে, ভাগ্যের কাছে কিছুই যেন আর চাইবার রইল না।

আর ইতিমধ্যে এডোয়ার্ড পার্লামেন্টে সদস্য পদ পেলেন সরকারী অনাচার অবিচারের তীব্র নিন্দা করে তিনি মাঝে মাঝে পার্লামেন্ট ভবন মুখরিত করে তুললেন অন্যদিকে প্যারিসে বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠতে দেখা গেল সেই সংগে আদর্শবাদী এডোয়ার্ড ডাবলিনে প্রকাশ্যে সরাসরি ঘোষণা করে 'ইউনাইটেড আইরিশম্যান' দলে যোগ দিলেন। ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি সদলবলে। অত্যন্ত গোপনে দলের কাজ চলতে লাগল বিভিন্ন দলীয় কাজের মধ্য থেকে এডোয়ার্ড বেছে নিলেন সব চেয়ে কঠিন কাজের ভার টা যে সমস্ত আইরিশ অভিজাত শ্রেণী বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ সরকারকে গোপনীয় সংবাদ দিচ্ছে তাদের ধরে ধরে একটা গুপ্ত স্থানে বন্দী করে রাখা হচ্ছে

কিন্তু একদিন হঠাৎ দলের গুপ্ত সংবাদ অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। দলের অনেকেই ধরা পড়ে গেল জেলের কারাগার ভর্তি হয়ে গেল 'ইউনাইটেড আইরিশম্যান' দলের সভ্য দিয়ে ভয় পামেলা বারবার স্বামীকে ফিরে পেতে চাইলেন কিন্তু সরকারের থেকে বিপ্লব আদর্শবাদী এডোয়ার্ড তখন কোথায় কোন দিকে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন ... পিস্তল ... ছদ্মবেশ ধরে বেড়াতে লাগলেন এখানে সেখানে কখনও বা পরচুলা পরে একজন অভিজাতের ছদ্মবেশ কখনও বা চাষার পোষাকে দেখা যেতে লাগল তাঁকে কিছুতেই রাজ সৈন্যবাহিনী তাঁর নাগাল পেল না। সংকটময় ভাবে তাঁর জীবনের মূল্য এক হাজার পাউণ্ড ধার্য করা হল ফিটজজেরাল্ড তবুও দমলেন না দলের অন্যান্য সঙ্গী সাথীরা তাঁকে একে একে ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল। ভয়ার্ত পামেলা বার বার তাঁকে ফিরে আসবার জন্য কাতর মিনতি জানাতে লাগলেন। কিন্তু এডোয়ার্ড নির্বিকার

গোপনে তিনি বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে বেড়াতে লাগলেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। এই আশ্চর্য কর্মীটির আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জনতার মধ্য থেকে তেমন সাড়া জাগল না। আর একদিন রাত্রে পরিশ্রান্ত ঘুমন্ত অবস্থায় পলাতক এডোয়ার্ডকে সম্রাটের সৈন্যদের হাতে অর্থের বিনিময়ে ধরিয়ে দিল একজন সাধারণ গ্রাম্য ব্যবসায়ী। জুডাসের হাত আবার নতুন করে একবার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত হল যদিও সম্রাট-সৈন্যের সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ চালালেন এডোয়ার্ড। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে একাকী বীরের মত অগুনিত সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তিনি, তারপর একসময় একটা বন্দুকের গুলি এসে তাঁর হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি বিদ্ধ হল। রক্তাক্তদেহে মৃতপ্রায় বীর ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়বার আগে একবার চিৎকার করে উঠলেন,

'তোমরা আমার মৃত্যু সংবাদটা পামেলাকে আস্তে আস্তে দিয়ো। ও বড় কোমল, এই ভয়ংকর সংবাদটা একবারে বলে ফেললে ও সহ্য করতে পারবে না।' বলতে বলতে কথা হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন লর্ড এডোয়াড ফিটজারেল্ড।

খুব দ্রুত ফিটজারেল্ড-এর গ্রেফতার হবার সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল দেশময়। পামেলার কানে গিয়েও সংবাদটা পৌঁছুল যথাসময়ে। সেই সংবাদে জ্ঞানহারার মত সমস্ত লোক-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ঘুমের পোশাক-পরা অবস্থায় প্রাসাদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন পামেলা। একটা আর্ত চিৎকার করতে করতে তিনি উন্মাদিনীর মত রাস্তা দিয়ে ছুটে যেতে লাগলেন। শোনা যায় পামেলার চিৎকারে সে রাত্রে সমস্ত ঘুমন্ত গ্রামবাসীর নিদ্রা ছুটে যায়। তারা ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। রাস্তার দুধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উন্মাদিনী রূপসী পামেলাকে আতকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে ছুটে যেতে দেখে।

সারা রাত্রি ছুটে কাকভোরে পামেলা শহরের জেলখানার দরজায় গিয়ে পৌঁছান। তারপর সারাটা দিন ধরে তিনি জেলখানার সেপাই

সান্ত্রীদের আকুল হয়ে মিনতি জানান অন্তত একবার তাঁকে যেন এডোয়ার্ডকে চাক্ষুস দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ রূপসীর আকুল ক্রন্দনেও সেপাই সান্ত্রীদের লৌহ হৃদয় টলে না। আর নির্জন কারাকক্ষে মৃতপ্রায় এডোয়ার্ড ফিটজারেল্ড মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান ক্রমশ যথাসময়ে চিকিৎসা না হওয়ায় তাঁর শরীরের ক্ষতগুলি ক্রমশ পচে উঠে ভয়ংকর গ্যাংগ্রিনে রূপান্তরিত হয় অসহ্য শারীরিক কষ্টে অজ্ঞান অবস্থায়ই কেটে যায় তার দিনরাত্রি। তিনি জানতেও পারেন না জেলগেটের বাইরে একটি জীবন্ত প্রাণ একাকী দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকণ্ঠিতের মত দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অপেক্ষায় 'আমি জানি কী ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে ওঁর, বিড়বিড় করে আপন মনে বলেন পামেলা, ও ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে' যেন চোখের সামনে রক্তাক্ত অসুস্থ মৃতপ্রায় এডোয়ার্ডকে দেখতে পান পামেলা এক নাগাড়ে দু-দিন দু রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে দেবার পর হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি

'এডোয়ার্ড আর বেঁচে নেই'

উন্মাদের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন পামেলা ফিটজারেল্ড জেলগারদের সেপাই সান্ত্রীরা বিস্মিত হয়ে যায় কারণ বন্দীর মৃত্যুর সংবাদ তো তারা পায়নি ছুটে গিয়ে ওরা এডোয়ার্ডের ঘরে ঢুকে দেখতে পায় এক মুহূর্ত আগে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চিরদিনের মত শান্ত হয়ে গেছেন এডোয়ার্ড ফিটজারেল্ড

# ছেলেদের মত অসভ্য কেউ নেই



## পরিবারের তিন ভ্রষ্ট পুরুষ

এক ডাকে পরিবারটিকে চিনবে ইংল্যাণ্ডের লোক। এই পরিবারের প্রধান পুরুষ উইলিয়াম সিসিলের আমল থেকেই পরিবারটি সরকারী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী পরিবার হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। আসলে উইলিয়াম সিসিল প্রথম এলিজাবেথকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করেছিলেন আর সেই থেকেই পরিবারটির উন্নতি। উইলিয়াম সিসিল মৃত্যুর আগে পুত্র প্রথম আর্ল অফ সালিসবেরীকে রানীর মন্ত্রণাদাতার পদে অধিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই সুদীর্ঘ চারশ বছর ধরে ওই পরিবারের পুরুষেরা সরকারী উচ্চ আসনে বসে আসছেন। ব্যতিক্রম ঘটেছে কেবল এই পরিবারের তিনজন পুরুষের বেলায়। এদের মধ্যে একজন তো ছিলেন জড়ভরত গোছের, অন্যজন সারাজীবন মেতেছিলেন নীচু ধরনের আনন্দের খোঁজে, আর তৃতীয়জন শহরের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে দিয়ে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কাজে জীবন কাটিয়ে গেছেন। এদের কথা বাদ দিলেও

এই পরিবারের অন্যান্য পুরুষেরা নিজের নিজের কাজে দেখিয়েছেন যথেষ্ট কৃতিত্ব; পারিবারিক সম্মান রক্ষা করেছেন দৃঢ় হাতে। নচেৎ আজও পর্যন্ত ইংলণ্ডের সরকার-বিষয়ে যে চালু রসিকতাটা প্রচলিত আছে, তা হল ইংলণ্ডের সরকার আসলে "দি হোটেল সিসিল আনলিমিটেডের" সম্পত্তি।

রসিকতা হিসাবে বলা হলেও কথাটা হয়ত একেবারেই মিথ্যা নয়। এই তো সেদিনও সুয়েজের কাদায় ইডেনের ভরাডুবি হলে রাণী পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মানুষ খুঁজতে গিয়ে সমস্ত দেশের মধ্য থেকে দুজনকেই খুঁজে পেয়েছিলেন একজন স্যার উইনস্টন চার্চিল অন্যজন সকলের আদরের 'ববিটি'কে নামটা অবশ্য তাঁর আদরের ডাকনাম, কিন্তু আসলে লর্ড রবার্ট আর্থার জেমস্ গ্যাসকয়েনী সিসিল মানুষটা হলেন টোরি পার্টির এক স্তম্ভ বিশেষ, যেমন শিক্ষিত তেমন দৃঢ়চেতা।

কিন্তু এসব তো গেল সালিসবেরী পরিবারের উজ্জ্বলতার দিক, [illegible] অংশ এর অপর পিঠেও কিছু মানুষ আছেন, পরিবারের সেই সব ভয়ঙ্কর চরিত্রেরা, যাঁদের নাম এই পরিবারের কেউ কখনো ভুলে কখনও উচ্চারণ করে না, যাঁদের বিচিত্র সব কেলেঙ্কারির ইতিহাস খুব সতর্কভাবে সঙ্গে এড়িয়ে যেতে চায়। এঁদের জীবনকাহিনী কেবল নারকীয় বিভৎসতায় পরিপূর্ণ যদিও আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, অসম্ভব নিবোধ তবুও, এদেরই জীবনকাহিনী সালিসবেরী পরিবারের কালিমালিপ্ত অংশ।

যেমন ধরা যাক চতুর্থ আর্ল অফ সালিসবেরী জেমসের কথা। সেকালে এই ব্যক্তিটির বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, 'মানুষটা যেমন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন তেমন নির্বোধ। আর চেহারাটাও তাকিয়ে দেখবার মত, বেলুনের মত ফাপানো শরীর, নড়া-চড়া করতে ভীষণ কষ্ট হয় এমন মোটা। আকাট মুর্খের মত কথাবার্ত্তা, ভোঁতা মুখ-চোখের চেহারা।' যদিও সকলের বর্ণনার মত মানুষটা আসলে

খারাপ ছিলেন না। পারিবারিক ধনসম্পত্তি বাড়ানোর চেষ্টা ছিল তাঁর। বিয়ে করেছিলেন বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কুমারী ফ্রান্সিস বেনহামকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, সেই সম্পত্তি দখল নিতে পারেন নি কখনও জীবনে। কারণ বিয়ের সময় ফ্রান্সিসের বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। অতএব সেদিক থেকে বিফল হয়ে চেষ্টা করেছিলেন পরিবারের রাজনৈতিক সম্মানটাকে বাড়ানোর। যে মুহূর্তে তাঁর কানে গেল রাজা দ্বিতীয় জেমস রোমান ক্যাথলিকদেরই কেবলমাত্র সরকারী উচ্চ পদগুলি দেবেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক হয়ে গেলেন। কিন্তু এবারেও তার ভাগ্যে কোন সুফল ফলল না। কারণ তিনি রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে প্রোটেস্টান্ট উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের যুদ্ধ বাধল। ক্রমশঃ যুদ্ধের অবস্থা খারাপের দিকে গেলে চতুর্থ তখন বুক চাপড়ে কাঁদতে বসলেন। তৎকালীন একজন লেখকের বই থেকে জানা যায়, তিনি কান্নার সময় নাকি বার বার তার চারপাশের লোকজনদের গালাগালি করছিলেন এবং থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছিলেন নাটুকে গলায় 'হায় হায় না বুঝে ধর্মমত পালটালাম'।

দুর্ভাগ্য যেন তার পায়ে পায়ে ঘুরেছে চিরদিন। যে কাজেই হাত দিয়েছে সেখানেই বিফলতা এসেছে। দুষ্কর্ম করে অন্যসব ক্ষমতাশালী পরিবারের লোকেরা পার পেয়ে গেছে, কিন্তু তিনি ধরা পড়েছেন বারে বারে। পাশবিক অত্যাচার, নৃশংসতা ও জালজুয়াচুরির চার্জ এসেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবার। মিডলসেক্স-এর প্রধান জুরীরা তার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। পালাতে গিয়ে কোর্টে ধরা পড়েছেন। তারপর টাওয়ারের নোংরা ঘরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে বন্দী জীবন। যদিও পরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বেল দিয়ে খালাস পেয়েছেন। প্রতিটি কাজের ভিতর সারাজীবন কেবল নিজের নির্বুদ্ধিতায়, অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। ফলে সকলের চোখে হেয় হয়ে থেকেছেন চিরকাল।

অথচ আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাঁর পরিবারের ধনসম্পদ, সুনাম বৃদ্ধির দিকে। মৃত্যুও তাঁকে করুণা করে নি। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে তাঁর, ১৬৯৩ সালের ২৫শে অক্টোবর। অথচ তাঁকে হেটফিল্ডে সমারোহহীন কবর দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর চারদিন পরে। সকলের অবহেলায় তাঁর শব একটা ঘরে পচে গলে গন্ধ ছড়াচ্ছিল। জেমসের মৃতদেহের প্রতি কেউ সম্মানও প্রদর্শন করেনি। আর যদিও তাঁর মৃত্যুটা হয়েছিল বড় অদ্ভুত ও রহস্যময় ভাবে। বেদনা বিক্ষত নির্বোধ জেমস্ কয়েকদিনের জন্য বাগানবাড়িতে ফুর্তি করতে গিয়েছিলেন। অল্প কয়েকজন কেবলমাত্র সঙ্গে ছিল তাঁর। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, একঘেয়ে ক্লান্তিকর ফুর্তিতে বিরক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গীসাথীরা সবাই তাঁকে অচেতন অবস্থায় বাগানবাড়িতে ফেলে রেখে শহরে চলে আসে। একথাও শোনা যায় যে, বাগানবাড়িতে একটিও দাসদাসী উপস্থিত ছিল না। সেই পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ জেমসের তারপর দুটো দিন যে কী ভাবে কেটেছিল কেউ তার খবর ভালো করে জানে না। অবশেষে আচমকাই যেন তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর তারিখটাও পরে সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয় জেমসের ডাইরীর পাতা থেকে। ডাইরীর পাতায় ঐ দুদিন ধরে নিয়মিত ভাবে দিনের তারিখগুলো লিখেছিলেন তিনি, এলোমেলো অর্থহীন দু-একটা অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা শব্দও পাওয়া গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু তা থেকে তাঁর মৃত্যুর সত্য কারণটা জানা যায় নি। আর আশ্চর্য তাঁর এই রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে কোথাও কোন আলোচনা হয়নি। তাঁর পরিবারের লোকজনদের ব্যবহারে কোন শোক প্রকাশ পায়নি, বরং তাঁদের মুখেচোখে একটা স্বস্তির আনন্দ ফুটে উঠেছিল।

তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে সেই মর্মান্তিক নিদারুণ সত্যটা আবিষ্কৃত হয়েছিল। হেটফিল্ডের প্রাসাদে সিঁড়ির দেওয়ালে যে পারিবারিক চিত্রমালা আছে, সেখানে চতুর্থ জেমসের একমাত্র চিত্রটি রক্ষিত ছিল। প্রথা অনুযায়ী প্রতি বছরের মত সেবারেও একজন

'চিত্রশিল্পীর হাতে চিত্রগুলো দেওয়া হয়েছিল নতুনভাবে রং করার জন্য। আর তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল সত্যটা। নতুন করে রং করবার সময় চিত্র-শিল্পীটি আবিষ্কার করেছিলেন রোমান ক্যথলিক বিপ্লবী মোনমাউথের প্রতিকৃতিটিকে লুকিয়ে রাখবার জন্য চিত্রটির ক্যানভাসে হাল্কা রঙে আবছাভাবে জেমসের গোলালো প্রতিকৃতিটি আঁকা হয়েছে। ফলে ক্যানভাসের উপরিভাগের রঙ তুলে নেবার পর সেটি মোনমাউথের প্রতিকৃতি হয়ে যায়। অতএব হতভাগ্য জেমসের একটিও প্রতিকৃতি আর রইল না পারিবারিক চিত্রশালায় যেন মানুষটার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত চিহ্নও মুছে গেল।

আল জেমসের মৃত্যু ঘটল অক্টোবরে, আর নভেম্বরের এক রাত্রিতে প্যারিসের এক হোটেলের ঘরে এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। সম্পত্তির অংশ এবং একজন মহিলার ব্যাপার নিয়ে জেমসের দুই ভাই উইলিয়াম এবং চার্লাসের মধ্যে মারামারি হল। রাতের পোশাক পরা অবস্থায় গভীর রাত্রে দুই ভাই হোটেলের সমস্ত লোকজনদের জাগিয়ে প্রচণ্ড মারামারি শুরু করে দিলেন। তাদের পরস্পরের চীৎকারে সেদিন সারাপাড়ার মানুষজন হোটেলের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অনেক কষ্টে তাঁদের দুজনকে ছাড়িয়ে নেওয়া হলে পর দেখা গেল উইলিয়াম গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চালান করা হল তাকে, সেখানে দুদিন বাদে মারা গেলেন উইলিয়াম। সামান্য আঘাত নিয়ে চার্লাস সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

কিন্তু বড় দ্রুত তাঁরও মৃত্যু ঘনিয়ে এল। দীর্ঘদিন ধরে যে মহিলার সঙ্গে চার্লাসের গুপ্ত প্রণয় চলছিল সেই মহিলারই প্ররোচনায় চার্লাস রোমের এক রাস্তায় দিবালোকে গুপ্ত ঘাতকের ছুরিতে নিহত হলেন। শোনা যায় ছুরির আঘাত খেয়ে চার্লাস যখন রাস্তায় পড়ে গিয়ে চীৎকার করে ওঠেন তখন নাকি সেই প্রণয়িনী মহিলাটি একটি সুন্দর ঘোড়ায়-টানা-গাড়িতে চেপে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে চলে যান সেখান দিয়ে। তাঁর সেই গাড়ীর চাকার শব্দে চার্লাসের আর্তনাদ পথচারীদের

কারোরই কানে পৌঁছোয় না। একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, সময় মত হাসপাতালে পৌঁছুলে চার্লাস হয়ত মারা যেতেন না অমন অসহায় ভাবে। অনেকের মতে, মৃত্যুর সময় নাকি চার্লাস মৃত উইলিয়ামের নাম ধরে বার দুয়েক ডেকে উঠেছিলেন।

এইভাবে অত্যন্ত দ্রুত সিসিল পরিবারের একটা পুরো অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এই জটিল ভয়ংকর মৃত্যুর চক্রের ভিতর যেন পঞ্চম আর্ল, জেমসের একমাত্র পুত্র এক বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন।

অথচ সেই ভালোমানুষ, বিকৃতরুচি ও অক্ষম পুত্রের জন্য কত বড় আশাই না ছিল চতুর্থ আর্লের পত্নীর তিনি চেয়েছিলেন পুত্র তার সিসিল পরিবারের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবে। সকলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে ছেলের পিছনে পরিশ্রমও তিনি কম করেন নি। নিজের বুকে আগলে রেখেছেন, রেখেছেন কড়া শাসনে। একটুও এদিক ওদিক হতে দেন নি। ইংলণ্ডের সেরা সেরা মাস্টার পণ্ডিতের হাতে ছেলের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু যতই দিন গেছে, যতই বয়স বেড়েছে পঞ্চম আর্লের ততই তিনি পুত্রের মধ্যে স্বামীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখেছেন বরং রুচির দিক থেকে স্বামীর চেয়েও বিকৃত ও নীচ ধরনের রুচি লক্ষ করেছেন তিনি পুত্রের স্বভাবে। ফলে হতাশায় তার শরীর মন ভেঙে গেছে, সংসারের থেকে, ছেলের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ক্রমশ। এমনও দেখা গেছে, লজ্জায় দুঃখে তিনি সামাজিক অনুষ্ঠানেও আর তেমন করে যোগ দেন নি পূর্বের মত। পুত্রকে শহরের বাড়িতে ফেলে রেখে তিনি চলে গেছেন গ্রামের বাড়িতে। জীবিত অবস্থায় আর ওমুখো হয় নি

আর অন্যদিকে পঞ্চম আর্ল লণ্ডনের রাস্তায় উদ্দামভাবে ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে গাড়ি উল্টিয়ে দিয়ে মজা পেয়েছেন, নোংরা মেয়েমানুষদের নিয়ে প্রাসাদ ভরে ফেলেছেন। দেখা গেছে রাতের পর রাত সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিকৃত রুচির সব মেয়েমানুষদের নিয়ে ফুর্তি করেছেন

তিনি। চাকর সহিসদের বউ মেয়েদেরও এই বীভৎস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা গেছে। জানা যায় পঞ্চম আর্লের সর্বাধিক প্রিয় মেয়েমানুষটি এসেছিলে তাঁরই আস্তাবলের সহিসের ঘর থেকে। প্রভুর এই স্বৈরাচারের জন্য আপত্তি করায় সহিসটিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে কেটে ফেলে বন্য কুকুরদের দিয়ে খাইয়েছিলেন পঞ্চম আর্ল। সহিসের সেই নিরক্ষর, বিকৃতরুচির স্ত্রীটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য পঞ্চম আর্ল একের পর এক সম্পত্তি বিক্রি করেছেন, সিসিল পরিবারের মুখে কলঙ্ক মাখিয়েছেন। শোনা যায় তার সবচেয়ে প্রিয় আমোদ ছিল ঘরের মেঝেয় মহিলাদের শুইয়ে দিয়ে তাদের নগ্ন শরীরের উপর দিয়ে গড়াগড়ি দেওয়া।

এই উদ্দাম বীভৎস জীবনযাত্রার ফলে খুব অল্প বয়সেই পঞ্চম আর্লের জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে, অত্যন্ত তরুণ বয়সেই তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে কেমন বুড়োটে দেখিয়েছে তাঁকে। শরীরের বিচিত্র সব রোগে এক একসময় তাঁকে উন্মাদ অবস্থায়ও দেখা গেছে। তারপর ধীরে ধীরে সিসিল পরিবারের সমস্ত মানসম্মান, ধনসম্পত্তি খুইয়ে খুব অল্প বয়সেই মারা গেছেন পঞ্চম আর্ল। তাঁর মৃত্যুতেও কোনো সমারোহ হয় নি, এমনকি সামাজিক নিয়ম হিসাবেও পঞ্চম আর্লের শবযাত্রায় ইংলণ্ডের বিখ্যাত সব পরিবারের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন নি। তার শবযাত্রায় ভাড়াটে গুণ্ডা, দালাল ও নোংরা মেয়েমানুষরা কেবলমাত্র যোগ দিয়েছিল বলে শোনা যায়।

সিসিল পরিবারের হৃতগৌরব আবার ফিরে আসে সপ্তম আর্লের সময়। এই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষটির জন্য সিসিল পরিবার আবার পুরাতন রাজনৈতিক ও সরকারী ক্ষমতার অধিকারী হয়। অত্যন্ত দ্রুত তিনি রাজা তৃতীয় জর্জের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ফলত রাজার দাক্ষিণ্যেই পুরানো গৌরব ও ধনসম্পদ আবার ফিরে আসে। রাজা সপ্তম আর্লকে লর্ড চেম্বারলিনের পদে অভিষিক্ত করেন।

দীর্ঘদিন বাদে আবার সিসিল পরিবারের লোকের সমাজে মাথা

উঁচু করে দাঁড়াল, যেন দীর্ঘকাল পরে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রাণমন ঢেলে চতুরতার সঙ্গে আর্ল তাঁর কাজ করে যান। কাজটাকে বড় চমকপ্রদও মনে হয় তাঁর। একে একে পুরোনো প্রতাপ প্রতিপত্তি ফিরে পেলেও তিনি বেসামাল হন না। সত্যি যেন বড় সহজে সব কিছু তাঁর হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়। হার্ট ফোর্ডশায়ারে একবার ভোটের সময় জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে অপেরার টিকিট বিলি করেই তিনি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। জীবনে বাইরের দিক থেকে সমস্ত রকমের সাফল্য ঘটিয়েও তিনি কিন্তু নিজের ঘরে স্ত্রীটিকে তাঁর ব্যবহারের দিক থেকে সহজ করে তুলতে পারেন নি এবং দীর্ঘ পঁচাশি বছর পর্যন্ত সেই অদ্ভুত স্বভাবের ভদ্রমহিলাটি লোকের চোখে বিস্ময় হয়ে থেকেছেন। অথচ বাইরে থেকে দেখতে গেলে সেই বিখ্যাত লেডি এমিলি ছিলেন অসম্ভব রূপসী আর গুণবতী মহিলা। যদিও তার চলাফেরায় খানিকটা পুরুষালি ঢং ছিল তবুও বিভিন্ন সব সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেক পুরুষই যোগ দিতেন কেবলমাত্র এমিলির আকর্ষণে। কিন্তু বড় রহস্যময় প্রকৃতি ছিল তাঁর হয়ত কোনো অনুষ্ঠানে কোনো পুরুষকে চোখে লেগেছে তার, তিনি গোপনে তার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন কয়েকদিন বড় জোর একসপ্তাহ তারপরই সেই নবলব্ধ প্রেমিকটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন একদিন প্রকাশ্যে প্রাসাদে এসে পান ভোজনে যোগ দেবার জন্য। সেদিন সন্ধ্যার আসরে মধ্যমণি হয়ে বসেছেন এমিলি। তার রহস্যময় হাসি, উত্তেজক কণ্ঠস্বর ও আবেদনময় পোশাক পরিচ্ছদ প্রেমিকটিকে মাতাল করে তুলেছে। এক সময় পানভোজন শেষ হয়েছে, যথারীতি প্রেমিকটি আনন্দে বিগলিত হয়ে গেছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এমিলি তাকে ডেকে এনেছেন তার সর্বাধিক প্রিয় জুয়াখেলার ঘরে। খুব স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে বাজী ধরে খেলা শুরু হয়েছে তারপর। এক একজন ক্লান্ত হয়ে খেলার টেবিল থেকে উঠে চলে গেছেন পকেটের সমস্ত সোনার টাকাগুলো বাজীতে হেরে। আর সেই সময় ধরা পড়েছে

এমিলির আসল চরিত্রটি, পাকা জুয়াড়ীর মত তখন তিনি কেবল জেতা অর্থ ব্যাগ ভরে গুছিয়ে তুলেছেন। এক একজনের বেলায় দেখা গেছে এমিলির জয়ে তাঁরা মরিয়া হয়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বাজী ধরেছে আবার, আর আশ্চর্য প্রতিবারই তাঁরা হেরে গিয়ে জ্ঞান হারার মত আরো প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে নতুন দান ফেলেছে সেসব বাজীতেও এমিলিই জিতেছেন। শোনা যায় বাজী ধরে তাস খেলে এক একদিন রাত ভোর করে দিয়েছেন এমিলি। তাঁর জানু পর্যন্ত ডুবে গেছে তাসের বোঝায়, আর তাঁর সুন্দর কারুকার্য করা বিশাল ব্যাগটা ভরে গেছে স্বর্ণমুদ্রায়। এক একজন প্রেমিক আতঙ্কিত হয়ে সরে গেছেন এমিলির কাছ থেকে। কিন্তু এতে তাঁর কোনো খেদ দেখা দেয় নি বরং নিত্য নতুন প্রেমিক নিয়ে তিনি জুয়ার টেবিল ঘিরে বসেছেন আবার।

যদিও এক একসময় ক্লান্তি এসেছে এমিলির জীবনে। হয়ত এক নাগাড়ে মাস দুই রাত জেগে জুয়া খেলার পর কয়েকদিনের জন্য তাঁর শরীর মন ক্লান্ত হয়ে গেছে। তখন দেখা গেছে অন্য বিচিত্র এক নেশায় মেতেছেন তিনি। তেজী দামী ঘোড়ায় চেপে একদল হাউণ্ড নিয়ে তিনি মাইলের পর মাইল শিয়াল শিকারের নেশায় মেতে থেকেছেন তখন। তাস খেলার মত ঘোড়ার পিঠে বা শিয়াল শিকারের ব্যাপারে তিনি অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছেন জীবনে। কোনো পুরুষই তাঁর সঙ্গে এই সব কাজে এঁটে উঠতে পারেন নি কখনও। বরং দেখা গেছে পরিশ্রান্ত পুরুষরা বিশ্রাম শিবিরে বসে পান ভোজন করছেন আর একা এমিলি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পোষা হাউণ্ডের সঙ্গে শিয়ালের খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন বনে জঙ্গলে।

এইভাবে সেই বিচিত্র ভদ্রমহিলার বয়স বেড়েছে। সপ্তম আর্ল প্রথম মারকুইস অফ সালিসবেরী পদে অভিষিক্ত হয়ে মধ্যবয়সে মারা গেছেন। কিন্তু লেডি এমিলির জুয়া খেলায় বা ঘোড়া ছোটানোয় একটুও ভাঁটা পড়ে নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টিটা



৩

ক্ষীণ হয়ে গেছে তাঁর, ঘোড়ার পিঠে চড়বার সময় বা বেড়াগুলো লাফিয়ে পার হবার সময় একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু এসব কাজে নেশা তাঁর একটুও কমে নি। বরং সত্তর বছর বয়সের সময়ও দেখা গেছে এমিলি ঘোড়া ছোটাচ্ছেন পূর্ণোদ্যমে, কেবল বেড়া-গুলোর কাছে এসে সহকারী যখন চীৎকার করে উঠেছে, 'এইবার লাফ দিন' তখন অবলীলায় তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়া পার হয়ে যাচ্ছেন। এসব সত্বেও পঁচাশি বছর বয়সের সময় জুয়ার টেবিলে বসে আগুনে পুড়ে এমিলির মৃত্যুর ব্যাপারটা সকলের চোখে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। তাঁর নিদারুণ করুণ মৃত্যুটার জন্য অনেকে দায়ী করেছে তাঁর পরিচারিকাদের। কেউ কেউ আবার বলেছেন আগুন লাগানোর ব্যাপারটা তাঁর পুরোনো কোনো জুয়ার বাজিতে হেরে যাওয়া প্রেমিকের কাজ। কিন্তু সে যাই হোক লণ্ডনের সেই বিখ্যাত সালিসবেরী হাউসের পশ্চিমের অংশটা সেই ভয়ংকর আগুনে একদম পুড়ে গেছে। যদিও পরবর্তী সময় এমিলির ছেলে নতুন করে ঐ অংশটাকে তৈরী করেছিলেন কিন্তু বসবাস করতে এসে তিনি লক্ষ করেছেন রাত্রির দিকে ঐ অংশের দেওয়াল থেকে এক অদ্ভুত ধরনের ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে, এমন কি সেই হাওয়া সহ্য করতে না পেরে এমিলির পুত্রবধূ বসবাসের আঠারো মাসের মধ্যেই অদ্ভুত এক রহস্যময় রোগে মারা যান।

দীর্ঘ চারশ বছর ধরে এই সিসিল পরিবার পতন ও উত্থানের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এসে বর্তমানে অন্য কোনো নতুনতর ভবিষ্যৎ-এর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা কে জানে।



A lovely girl

# বিষকন্যা

উডবার্ন প্রাসাদের পারিবারিক সংগ্রহশালায় সেই কুখ্যাত রমনীটির কোনো স্মৃতিই আজ আর প্রদর্শিত হয় না। এমনকি তাঁর নাম উল্লেখ করতেও তাঁর পরিবারের লোকজনদের আজ প্রবল দ্বিধা ও সংকোচ। এই বিষকন্যাটির নাম এঁরা বার বার ভুলে যেতে চেষ্টা করেন, এড়িয়ে যেতে চান তাঁর সম্বন্ধে যাবতীয় কৌতূহলী প্রশ্ন.

জন রবার্ট রাসেল, অতি কুখ্যাত ডিউক অফ বেডফোর্ড—এঁর মত মানুষও মৃত্যুকরের দেনা পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহের জন্য প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে নিজের প্রাসাদের দরজা, পারিবারিক দলিল, চিত্র বা উন্মাদ বাতিকগ্রস্থ পূর্বপুরুষদের সংগৃহীত ধনসম্পদ দেখানোর সময় এই মহিলাটির ইতিহাস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর বিষয়ে কিছু বলতেও তাঁর বুক কেঁপে উঠেছে। অথচ মহিলাটি ছিলেন বেডফোর্ডের পঞ্চম কাউন্টেস্-এর জননী।

তাঁর কোনো চিহ্নই আজ আর উডবার্ন প্রাসাদের কোনো ঘরে

সংরক্ষিত হয়ে নেই। কেবলমাত্র সরকারী দলিল-দস্তাবেজেই জীবনের কাহিনী লেখা আছে তাঁর। ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ হত্যাকাণ্ডের তিনি ছিলেন নায়িকা।

অথচ সেই আর্ল অফ সাফোকের কন্যা ফ্রান্সিসের রূপের বুঝি অন্য কোনো তুলনা ছিল না। সমসাময়িকদের মতে তিনি ছিলেন রূপের এক জ্বলন্ত শিখা, মিষ্টি মাদকতায় ভরা। একুশ বছর বয়সের আগে বিয়ে করেছিলেন দুবার, মিথ্যা ভাষণে ছিল তাঁর অত্যন্ত দক্ষতা, ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ, বশীকরণ ইত্যাদিও জানতেন কিছু কিছু। কিন্তু খুব অল্প বয়স থেকেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। শিশু-অপরাধীদের তালিকায় তাঁর মত একজনকেও আর পাওয়া যায় নি তৎকালীন যুগে।

বয়স যখন তেরো, তখন তিনি বিয়ে করেছিলেন চৌদ্দ বছরের এসেক্সের আর্ল রবার্টকে। ১৬০৬ সালে চৌদ্দ বছরে বিয়ে করার ব্যাপারটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক সংবাদ ছিল, তবু সকলে আশা করেছিল ওই রূপবতী কন্যা আর কালো চোখের ঐ রূপবান বালকটি ভবিষ্যতে আদর্শ সুখী দম্পতি হয়ে উঠবে।

কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটল। বালিকাবধূটিকে ফেলে রেখে রবার্টকে সেনাবাহিনীর শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে হল সরকারী নীতি অনুযায়ী। আর এদিকে ফ্রান্সিস্ রাজ দরবারে যাতায়াত সুরু করলেন। রাজা প্রথম জেমসের দরবারে তাঁর রূপের পসরা আর মাদকতা ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হেনরী বা প্রিন্স অফ ওয়েলসকে তাঁর রূপের ফাঁদে বন্দী করে ফেললেন। তাঁকে নিয়ে রাজ দরবারে গোপন মনমালিন্য ও রেশারেশি সুরু হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ই এক কিশোর এসে রাজদরবারে হাজির হল। জাতে স্কচ, নাম রবার্ট কার। প্রথমে এসেছিল এক ধনীর পার্শ্বচর হয়ে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রাজদরবারের উচ্চ আসনে বসল সে।

অতি দ্রুত সেই দীর্ঘ, সবল, কমনীয় কিশোরটি রাজা প্রথম জেমসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। সাধারণত রাজা জেমসের কোমল চেহারার কিশোরদের প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। রাজদরবারের জনৈক ব্যক্তির বিবরণ থেকে জানা যায়, রাজা রবার্টের বাহুতে মাথা রেখে তার গালে চিমটি কাটতেন। সারা দিনের বেশীরভাগ অংশ রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন জেমস, মাঝে মাঝে রাত্রেও রাজার শয়নকক্ষে রবার্টের ডাক পড়ত। এক মুহূর্ত তাকে না হলে দিন কাটত না রাজার। ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল রাজা রবার্টকে রোচেস্টারের ভাইকাউন্ট, গার্টারের নাইট, উইনউইকের ব্যারনের পদও সারা জীবনের মত ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যালেসের রক্ষক নিযুক্ত করছেন, এবং রোচেস্টার প্রাসাদটির স্বত্ব লিখে দিয়েছেন। এর ফলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই রবার্ট কার দেশের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি হয়ে গেলেন। আর তাঁর রূপে খুব সহজেই আকৃষ্ট হলেন ফ্রান্সিস্। কিন্তু এদিকে ফ্রান্সিসকে নিয়ে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ আর রবার্ট কারের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হল। ঘটনাগুলো ঘটল এত দ্রুত যে কিছু বুঝে উঠবার আগেই এবং যেন ঠিক সময় বুঝেই বিদেশ থেকে ফিরে এলেন ফ্রান্সিসের কিশোর স্বামীটি। কী যে বুঝলেন সেই কিশোর স্বামীটি কে জানে। শুধু দেখা গেল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর গ্রামের প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন। বড় দ্রুত যেন নাটকের জমজমাট দৃশ্যের উপর ক্ষণকালের জন্য নেমে এল যবনিকা, অনাহুত হলেন দর্শকবৃন্দ আর ফ্রান্সিসের গুপ্ত প্রনয়ীর দল।

অভিমানে আশাহত ফ্রান্সিস গিয়ে প্রাসাদে নিজেকে বন্দী করে রাখলেন। সামাজিক মেলামেশা বন্ধ হল, ভোজসভার আয়োজন স্থগিত থাকল। গভীর হতাশার মধ্যে দিনরাত্রিগুলি কাটতে লাগল তাঁর আর শেষে নিজেকে আর শান্ত করতে না পেরে ফ্রান্সিস স্বামীকে উত্যক্ত করে তুললেন লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্য। অগত্যা প্রায় বাধ্য হয়েই ফ্রান্সিসকে নিয়ে লণ্ডনে ফিরে এলেন তাঁর স্বামী। হাসি ফুটল

ফ্রান্সিসের মুখে। ফ্রান্সিসের আগমণের সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল সহরে। চঞ্চল হয়ে উঠলেন তাঁর গুপ্ত প্রেনয়ীর দল এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই কারের সঙ্গে আবার দেখা হল ফ্রান্সিসের। স্বামী কাছাকাছি আছে বলে তাঁদের মিলন হতে লাগল অত্যন্ত গোপনে, লুকিয়ে-চুরিয়ে। কিন্তু সেই গোপন মিলনে কিছুতেই তৃপ্তি পেলেন না ফ্রান্সিস, কারের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে বন্ধনহীন মিলনের জন্য উন্মাদিনী হয়ে উঠলেন দিনে দিনে। আর তাঁর সেই উন্মাদ আগ্রহ থেকে নৃশংস এক হত্যাকাণ্ডের জন্ম হল।

কার ও ফ্রান্সিসের এই গোপন হত্যাকাণ্ডের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো হ্যামারসমিথের মিসেস টার্নার নামের একজন ভদ্রমহিলা। পোশাকের সঙ্গে কড়া মাড় দেওয়া হলুদ কলারের নক্‌শার প্রবর্তন করে ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যেই যুবক সমাজের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠে ছিলেন। এক ডাক্তারের বিধবা স্ত্রী এই টার্নারের এক রহস্যময় বন্ধু ছিলেন ডাক্তার ফোরমেন।

টার্নার গিয়ে ফ্রান্সিসকে বোঝালেন, ডাক্তার ফোরমেনই ওই কাজের উপযুক্ত লোক।

অতএব ফোরমেনের সঙ্গে ফ্রান্সিসের এক গোপন বৈঠক বসল। সমস্ত বিষয়টা নিয়েই তাঁদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হল; শেষে ডাক্তার তাঁকে তিনটি মোমের তৈরী মূর্তি উপহার দিলেন। সেই আশ্চর্য তিনটি মূর্তির মধ্যে একটি ছিল রবার্ট কারের, দ্বিতীয়টি আর্ল অফ এসেক্সের, আর তৃতীয়টি ছিল একটি আলুলায়িত-কেশ উলঙ্গ নারীমূর্তি। তিনটি মূর্তির মধ্যে কেবলমাত্র আর্লের মূর্তিটাই ছিল নিষ্প্রভ, রুগ্ন; অন্য দুটি সতেজ, জীবন্ত ও রূপ-লাবণ্যময়। মূর্তি তিনটির সঙ্গে ডাক্তার ভালোবাসার বিষয় একটি উত্তেজক প্রবন্ধও লিখে দিয়েছিলেন। (বছর খানেক পরে এই মূর্তি তিনটি ও প্রবন্ধটি ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে আদালতে নজির হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি মূর্তি তিনটি ও প্রবন্ধটির দিকে এক নজর তাকিয়েই

অসম্মতি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ওগুলোকে জনসাধারণের সামনে কিছুতেই উপস্থিত করা চলবে না বা প্রবন্ধটি পাঠ করাও যাবে না।) ওগুলো ছাড়াও ডাক্তার ফ্রান্সিসকে কয়েকটি বিষাক্ত বড়ি তৈরী করে দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিসের হাতে বড়িগুলো দেবার আগে মিসেস টার্নার তাঁর প্রেমিক স্যার আর্থার ম্যান্‌ওয়ারিং-এর উপর বড়ির গুণাগুণ পরীক্ষা করবার ভার দিলে স্যার আর্থার তাঁর বন্ধুর উপর বড়ির ব্যবহার করে রায় দিয়েছিলেন, ওগুলো আশ্চর্য ফলপ্রদ।

অতএব বড়িগুলো নিজের স্বামীর উপর ব্যবহার করতে আর কোনো দ্বিধা হল না ফ্রান্সিসের। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, কোনো ফলই পাওয়া গেল না বড়ির। তিনি হতাশ হলেন। ডাক্তার ফোরমেন চেষ্টা করলেন আবার কিন্তু এবারেও কোনো ফল হল না।

ফ্রান্সিসের চেষ্টায় যখন ফল হল না তখন রবার্ট কার স্বয়ং নিজের হাতে কাজের ভার নিলেন। রাজদরবারের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে হাত করে সোজা ক্যণ্টারবেরীর আর্চবিশপের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, আর্ল আর ফ্রান্সিসের বিবাহ বিচ্ছেদের।

'কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদটা কোন্ সূত্রে হবে?' বললেন আর্চবিশপ।

'কেন লর্ড এসেক্সের স্বামী হবার মত কোনো শারীরিক যোগ্যতা নেই বলে।' উত্তরে কার বললেন। এই যুক্তিটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না আর্চবিশপ। প্রায় অসম্ভব বলে মনে হল ঘটনাটা, কারণ তিনি ওই সুস্থ স্বাভাবিক তরুণ আর্লটিকে ভালোভাবেই চিনতেন।

অন্যদিকে স্ত্রীর ভালোবাসা বিপথগামী জেনে আশাহত আর্ল যখন ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছেন তখন তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা হল:

'আপনার স্ত্রী কি এই দীর্ঘ আট বছরের বিবাহিত জীবন কাটিয়েও কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন?'

উত্তরে আর্ল শুধু বললেন, 'আমার স্ত্রী তো তাই বলেন শুনতে পাই।'

অতএব ফ্রান্সিসকে পরীক্ষার জন্য একদল ধাত্রীকে নিয়োগ করা হল। তাঁরা পরীক্ষা করে ফ্রান্সিসের স্বপক্ষেই রায় দিলেন। ধাত্রীদের সামনে নিজের কুমারীত্বর পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সিস কিন্তু একটা শর্ত দিয়েছিলেন। পরীক্ষার সময় তাঁর মুখ পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকবে। এই শর্তের ব্যাপারে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল বাদে জানা গিয়েছিল ওই ধাত্রীরা যে মেয়েটিকে সেই সময় পরীক্ষা করেছিলেন সে ছিল ভিন্নজন, এসেক্সের কাউন্টেস্ ফ্রান্সিস নন। ধাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে বিশপদের কমিশন বিবাহ-বিচ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন।

অবশেষে, ফ্রান্সিস ভাবলেন তিনি মুক্ত, স্বাধীন, রবার্ট কারকে বিয়ে করবার ব্যাপারে তাঁর সমস্ত বাধাবিপত্তি কেটে গেছে।

কিন্তু না, তবু আপত্তি উঠল। টমাস ওভারব্যরি নামে ক্যাম্ব্রিজের একজন বিখ্যাত ছাত্র ও আইনজীবী যুবক আপত্তি তুললেন। যদিও আসলে ওভারব্যরি ছিলেন কারের পরামর্শ দাতা ও পত্রলেখক কিন্তু ফ্রান্সিসের সঙ্গে কারের বিয়ের ব্যাপারটাকে তিনি বাধা দিলেন। একদিন একজন চাকর হোয়াইট হলের এক ঘরের দরজায় কান পেতে শুনতে পেলো ঘরের মধ্যে ওভারব্যরি আর কারের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি চলছে। ওভারব্যরি চিৎকার করে কারকে বোঝাচ্ছেন: 'না, না ওই জঘন্য, ভয়ংকর মেয়েমানুষকে বিয়ে করা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। এ জাতীয় ঘটনা আমি আপনার জীবনে ঘটতে দিতে পারি না।'

ওভারব্যরির অসম্ভব ব্যক্তিত্বে বিচলিত হয়ে কার বুঝলেন, উনি যদি তাঁর চোখের সামনে থেকে না সরে যান তাহলে তাঁর পক্ষে ফ্রান্সিসকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

অতএব উপায়ন্তর না দেখে কার গিয়ে রাজাকে ধরলেন ওভারব্যরিকে কূটনৈতিক চাকরি দিয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ওভারব্যরির চাকরি হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য ওভারব্যরি

সেই চাকরি প্রত্যাখ্যান করলেন। আর কারও তাঁকে শাস্তি দেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। রাজার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে ১৬১৩ সালের ২৬শে এপ্রিল লণ্ডনের টাওয়ারে ওভারব্যরিকে বন্দী করা হল। সেখান থেকে তিনি আর কোনো কালে মুক্তি পেলেন না।

ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে ফ্রান্সিস তাঁর এক পারিবারিক বন্ধুকে লণ্ডন টাওয়ারের গভর্ণর করে দিলেন এবং তাঁর সাহায্যেই একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি রিচার্ড ওয়েসটনকে ওভারব্যরির নিজস্ব ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করা হল। আসলে ওই রিচার্ড ওয়েসটন একদা মিসেস টার্নারের ডাক্তার স্বামীর সহকারী ছিল। অতএব বড় দ্রুত আর অত্যন্ত সহজে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটা ঘটল। মিসেস টার্নার বিষের বড়িটা দিলেন ওয়েসটনের হাতে; ৬ই মে থেকে রহস্যময় অসুখে ভুগে ওভারব্যরি মারা গেলেন। বন্ধুকে সুস্থ স্বাভাবিক পরামর্শ দেবার জন্য হতভাগ্য ওভারব্যরির মৃত্যু ঘটল।

সেই বছরই রাজা কারকে আর্ল অফ সমারসেট পদে অভিষিক্ত করে দিলেন, আর এক শুভদিনে ফ্রান্সিসের সঙ্গে বিবাহ হল তাঁর। সুদীর্ঘ দিন বাদে ফ্রান্সিসের আশা সফল হল। প্রেমিককে পরিপূর্ণভাবে একান্ত করে পেলেন ফ্রান্সিস। দীর্ঘ আঠারোটি মাস নবদম্পতির উন্মত্তের মত কাটল। যেন তাঁদের দৃষ্টি থেকে মুছে গেল সমস্ত জগৎ-সংসার।

তারপর সেই ভয়ংকর কাহিনীটা লণ্ডনে ক্রমশ প্রচারিত হল। মৃত্যুর পূর্বে একজন ইংরেজ বালকের মুখ থেকে কাহিনীটা শোনা গেল। তার বিবৃতি অনুসারে জানা গেল, একজন ফরাসী ডাক্তারকে সে টাওয়ারের একজন বন্দীর উপর একটা বিষ প্রয়োগ করতে সাহায্য করেছিল। ফলে সেই বন্দীটির মৃত্যু ঘটেছে।

কাহিনীটি ছড়াতে ছড়াতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে গেল। বিভিন্ন বিচিত্র সব সংযোজনের ফলে গল্পটা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করল

যে, কাহিনীর উল্লেখ মাত্রেই মহিলারা আতঙ্কে মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। অবশেষে রাজা আসল বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বাধ্য হলেন।

১৬১৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়েসটন ধরা পড়ল। আটদিন ধরে ক্রমান্বয়ে জেরা করার পর ঘটনাটা পুরোপুরি জানা গেল তার মুখ থেকে।

২৫শে অক্টোবর ওয়েসটনের ফাঁসি হল, ১০ই নভেম্বর হল মিসেস টার্নারের। গর্ভবতী ফ্রান্সিসকে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে নিয়ে যাওয়া হল ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা শোনানোর জন্য। বিচারপতিরা তাঁদের বিচারে ফ্রান্সিস ও কারকে ফাঁসির আদেশ দিলেন। আতঙ্কে উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ফ্রান্সিস, রবার্ট কারের অবস্থা উন্মাদের মত হয়ে গেল।

কিন্তু অসম্ভব হল সম্ভব। শেষ মুহূর্তে ১৬১৬ সালে ১৩ই জুলাই রাজা ফ্রান্সিসের উপর থেকে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা তুলে নিলেন, তারও কয়েক বছর পরে কারও বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলেন। পাঁচ বছর বিচ্ছেদের পর প্রেমিকপ্রেমিকার আবার মিলন হল। উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায় মিলনের মুহূর্তে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘক্ষণ, পরস্পরের দিকে শীতল হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও পরে মুখ নামিয়ে নিয়ে শান্ত পায়ে যে যার ঘরের দিকে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা।

অনেকের মতে প্রথম অবস্থায় ফাঁসি হলেই বুঝি তাঁদের পক্ষে ভালো হত। কারণ অতঃপর দীর্ঘদিন তাঁরা পরস্পরের শত্রু হয়ে, অপরিচিতের মত একই প্রাসাদে বসবাস করে গেছেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যবর্তী শীতল শূন্যতাটুকু পার হয়ে এসে তাঁরা কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যও আর পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং যত দিন গেছে ততই তাঁদের মধ্যবর্তী শূন্যতাটা বিপুল আকার ধারণ করেছে। সেই প্রায়-নিস্তব্ধ, মৃত প্রাসাদের দুটি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে নিজেরা কেবল নিজেদের ঘৃণাই করে গেছেন তাঁরা।

তারপর ১৬৩২ সালের ২৩শে আগস্ট চিসউইকে চল্লিশ বছর বয়সে এক ঘৃণিত অসুখে মারা গেছেন ফ্রান্সিস। তাঁর মৃত্যু সংবাদে মুহূর্তের জন্য যেন বিচলিত দেখিয়েছে রবার্ট কারকে, পরক্ষণে শান্ত সংযত হয়ে মৃতের প্রতি পালনীয় সব কর্তব্য করে গেছেন তিনি। এতকাল বাদে নিজেকে বড় অসহায় বোধ হয়েছে রবার্টের। যেন বড় নিঃসঙ্গ, নির্জন।

ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর দীর্ঘ তেরোটি বছর শোকার্ত রবার্ট কার বেঁচে থেকেছেন। কন্যা অ্যানিকে বেডফোর্ডের প্রথম ডিউক উইলিয়াম রাসেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার পর সংসারের প্রতি তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব যখন শেষ হয়ে গেছে তখন রবার্ট শেষবারের মত একবার ফ্রান্সিসের কবরের সামনে এসে নতজানু হয়েছেন একদিন সন্ধ্যায় সকলের অলক্ষ্যে, অস্ফুটে কী কথা যেন বলেছেন অনেক্ষণ ধরে। পরে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে অতি সংগোপনে আপন শরীরে বিষ প্রয়োগ করে আত্মহত্যা করেছেন সেই রাত্রে। বড় করুণ আর যেন বড় নির্দয়ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছে দুটি নৃশংস প্রাণের।



# উপন্যাসের নায়ক

দুর্গম পথ, সুবিধামত যানবাহনের অভাব, তবু বিদেশ থেকে সাগর পেরিয়ে বিদেশী মানুষ আসত এদেশে। আর সে কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব মানুষ। ইংলণ্ডের ১৭২১ সালের সেই কবরের উপর ছন্দোময় স্মৃতিফলকে যে মানুষটির জীবনী লেখা আছে তা থেকে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বড় অদ্ভুত। স্মৃতিফলকে বলা আছে মানুষটি জন্মে-ছিলেন আমেরিকায়, বড় হয়েছিলেন ইংলণ্ডে, আফ্রিকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এলোমেলো ভাবে কিছুকাল, বিয়ে করেছিলেন ভারতবর্ষে, মারা গেছেন ইংলণ্ডে। ভারতবর্ষে থাকা কালীন তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। আমেরিকার সেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে মানুষটির নাম, অর্থাৎ ইলিহু ইয়েল।

আসলে নর্থ ওয়েল্‌সের লোক তাঁরা, কিন্তু জন্মেছিলেন আমেরিকায়, যখন তাঁর বাবা মা ব্যবসায়ের কাজে সেখানে ছিলেন। লেখাপড়া ক ছিলেন ইংলণ্ডে এবং পূর্বদেশে গিয়ে জীবনের উন্নতি সাধন করবেন

আশায় ১৬৭২ সালে এসেছিলেন মাদ্রাজে, যখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। সেই তাজা নবীন যুবকটি খুব অল্পদিনে চাকরীতে দ্রুত উন্নতি করে ১৬৮৭ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর হলেন এবং সে কাজে ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর। যখন তাঁকে দায়িত্ব ও হিসেবপত্তর বুঝিয়ে দেবার কথা উঠল, তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনদের ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে এদেশে থেকে গেলেন আরো সাত বছর। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে শুরু করলেন হীরা জহরতের ব্যবসা। ভারতবর্ষে থাকাকালীন গোপনে সে ব্যবসা সম্বন্ধে তিনি পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষত গোলকুণ্ডার রাজার সঙ্গে তাঁর ব্যবসা চলত। ফলে হীরা জহরত সম্বন্ধে তিনি প্রায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন সমাজে। গোপনে ব্যবসা চালাতেন তবু গভর্ণর হিসাবে অনেক নতুন নতুন ব্যবস্থা তিনি চালু করেছিলেন, যেমন শাসন ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন, মাদ্রাজে কর্পোরেশন চালু করা, মেয়রের পদসৃষ্টি প্রভৃতি।

তথাপি ইয়েল ছিলেন এক রহস্যময় মানুষ, দুর্বোধ্য এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে তিনি বাস করতেন। অতএব তাঁকে নায়ক করে শ্রীমতী এফ ই পেনী 'ডায়মণ্ড' নামে এক উপন্যাস লেখেন। নায়ক ইয়েল এবং তৎকালীন দেশী বিদেশী সমাজের পাত্রপাত্রীদের নিয়ে এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। একজন বিদেশিনীর চোখে তৎকালীন ভারতবর্ষ, তার জনসাধারণ অবিশ্বাস্য এক বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। এক এক অংশে লেখিকার বর্ণনাকে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। পড়তে গেলে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে যায়, বিস্মিত হতে হয় কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষই না ছিলেন সে যুগে। আর কত বিচিত্র ধরনের ছিল তাঁদের কার্যকলাপ।

১৬৮৭ সালের ৯ই অক্টোবরে মাদ্রাজের সেই ভয়ংকর ঝড়ের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে উপন্যাসে, তা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। যেহেতু তখনকার দিনে সমুদ্র আর নদীই ছিল যাতায়াতের সবচেয়ে সুবিধা-

জনক পথ। ফলে সেদিন মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূল ভরে গিয়েছিল ভাঙা জাহাজ আর নৌকোর কাঠে। ভয়ংকর চিৎকার উঠছিল সমুদ্র থেকে, বাতাস বইছিল দিক হারিয়ে। মানুষেরা বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। সকাল বেলায় সমুদ্রের বেলাভূমি কৌতূহলী জনতায় ভরে গিয়েছিল কিন্তু পরে তারা আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালিয়েছিল সেখান থেকে। ইয়েলও এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই জনতার ভীড়ে। মাকাওবা ছুটে এসে তাঁকে দিচ্ছিল কোম্পানীর জাহাজ 'বণিও'র ডুবে যাবার সংবাদ, সেণ্ট টমাস কোস্টের কাছে অন্য জাহাজগুলোর দুর্দশার কাহিনী। তখনও সমুদ্রের বালির উপর পড়েছিল ভাঙা জাহাজের টুকরো, ছিন্নভিন্ন মাস্তুল, নিমজ্জিত নাবিকদের শব। আর সেই নাবিকদের শবের স্তূপ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল একজন অর্ধমৃত নাবিককে। যার কাছ থেকে জানা গিয়েছিল ভয়ংকর এক গোপন ব্যবসার সংবাদ। তৎকালীন যুগে কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের অল্প বেতনের জন্য কোম্পানীর নির্দেশ অমান্য করে গোপনে যেসব বিভিন্ন ব্যবসা চালাত তাদের মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যবসা ছিল দাস ব্যবসা। আর জীবন্ত মানুষও বড় সুলভ ছিল তখন। প্রায়শই পূর্ণ বয়স্ক, শিশু ও মেয়েরা মাদ্রাজ শহরের বুকের উপর হারিয়ে যেত, অর্থাৎ গোপনে তাদের ধরে আনা হত। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে এমনি লোহার শিকলে বাঁধা চারজন দাসকেও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সমুদ্রের তীরে পাওয়া গিয়েছিল সেদিন। ফলত এ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ইয়েল জানতে পারলেন, পিট ডেনবার্গ, জার্সির ভাগ্নে—একজন নিগ্রো চাকর ও দেশী রামলিঙ্গম নামে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই গোপন ব্যবসাটি চালায়। ইয়েলকে এসব খবর সরবরাহ করেছিল একজন ব্যবসায়ীর স্ত্রী শ্রীমতী পাভিয়া। পরবর্তীকালে ইয়েলের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার বন্ধুত্ব নিয়ে প্রচুর বদনামও রটে। কিন্তু সে যাই হোক, দাস ব্যবসায়ের গোপন সূত্রটি যখন অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন ইয়েল, তখন একজন সরকারী

কর্ম্মচারী হিসাবে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হল দোষীদের জন্য। কিন্তু তৎকালীন যুগের নথিপত্র বা বিভিন্ন মানুষের বিবরণ থেকে পরে জানা যায় আসলে ইয়েলের শাস্তির ব্যবস্থাটি ছিল পুরোপুরিই প্রহসন। গোপন অপরাধীদের দূর দেশে চালান করে দিয়ে ইয়েল লোকের সামনে নকল শাস্তির ইস্তেহার ঝুলিয়ে নিজের দিকটা বজায় রাখলেন। এই ভাবেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আপন সুনামটি বজায় রেখে কিছুদিন সরকারী কাজ চালালেন নিপুনতার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন ধরা পড়ে যেতে হল তাঁকে। আর তার আগে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ঘটল ইয়েলের জীবনে। বিচিত্র এক নারীর সঙ্গে ঘনিষ্টত হল তার।

ইয়েলের গোপন প্রণয়িনী শ্রীমতী পাভিয়ার চরিত্রটি চমৎকার বর্ণনা করা হয়েছে উপন্যাসে। বিশাল এক তালপাতার আকৃতি ঘরে থাকতেন তিনি, গড়গড়ায় তামাক টানতেন, জনাকতক দাসদাসী তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকত। মহিলাটি সারাদিন শুয়ে শুয়ে গল্প-গুজব করতেন, দামী-দামী খাবার খেতেন, দেশী ব্যবসায়ীরা তাঁর পায়ের তলায় মাদুরের উপর তাদের দোকান পসরা খুলে ধরত। সুরাটের সবচেয়ে দামী সাটিনের পোশাক গায়ে দিয়ে, চীনদেশের সবচেয়ে ভাল সিল্কের বালিশে হেলান দিয়ে, ভয়ঙ্কর দামী পাথরের মালা গলায় ঝুলিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দরকষাকষি করতেন। পারস্যের গোলাপের গন্ধ, দামী আতরের সুবাস ঘরের বাতাসে ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে থাকত। আর সেই মার্বেল পাথরের মেঝে দামী কাশ্মিরী গালিচা পাতা ঘরে ঢুকলেই কেমন যেন ঘুম আসত সকলের। অনেক রাত্রে ইয়েল আসতেন এই বিচিত্র রমণীটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। গোপন প্রেমিকটিকে নিয়ে শ্রীমতী পাভিয়া যেতেন বিশিষ্ট এক কুঞ্জবনে। বাগানের এক ঘন ঝোপের আড়ালে ছিল তাঁর এক অদ্ভুত আকৃতির গোলপাতার ছাউনি দেওয়া একটা লুকোনো কুটির। প্রেমিকযুগল তারপর তাঁদের বাসর সাজাতেন সেই

ঘরে। ভোর বেলায় আবার তাঁরা সেই কুটির ছেড়ে বাইরে আসতেন, শেষবারের মত আলিঙ্গন ও চুম্বনের পর বিদায় নিতেন তাঁরা।

স্বদেশবাসীদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীমতী পেনী বলেছেন, তাঁরা ছিলেন অসৎ আর ভয়ঙ্কর সব চরিত্রের। লোক ঠকানোর কাজ ছিল তাঁদের। শিবাজী যখন শহর আক্রমণ কবেছিলেন, তাঁদেব আর দুর্দশার সীমা ছিল না। আর তখনকাব বিদেশীদের পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল অপূর্ব। দামী পাগড়ি মাথায় দিয়ে পাজামা পবে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন সবসময়। এ পোশাক তাঁদের এত প্রিয় ছিল যে, সরকারা নোটিশ জারি করতে হয়েছিল, চার্চে বা পরবের সময় তাঁরা যেন ঐ পোশাকে না আসেন। আর কী সব নাটকীয় ছিল তাঁদের চরিত্র। ডানভাবগার্গ-এব চাকর সোলেমান তার স্ত্রীর প্রতি অসৎ আচরণ করায় প্রভুকে হত্যা কবে তাঁর মণিমুক্তোয়ভরা বাইবেলখানা হস্তগত করে পালিয়ে গিয়েছিল এক গভীর জঙ্গলে। আর নাকি কোনোদিন তাকে লোকালয়ে দেখা যায় নি।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে ইয়েল ফিরে গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে এবং ১৭০০ সালের সেই বিখ্যাত নীলামে তিনি তাঁব জিনিষপত্র বিক্রি করে মণ্ট স্ট্রীট কিনেছিলেন বিশাল এক প্রাসাদ। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত সব পরিবারে, তাঁর দ্বিতীয় কন্যা পববর্তী জীবনে ডাচেস অব ডিভনশিয়ার হয়েছিলেন। তাঁব নামে নিউ হাভানায় এক স্কুল বাড়ি তৈরী করবার জন্য ইয়েল কয়েকটি ট্রাঙ্কভর্তি জিনিষপত্র পাঠিয়েছিলেন, যা বিক্রি করে আট হাজার পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল।

এক অদ্ভুত দেশে বিচিত্র সব মানুষেরা আসত তখন, অত্যাচার আব অবিচারে দেশেব মানুষদের পঙ্গু করে দিয়ে ফিরে যেত আবার নিজেব দেশে, আব সেই কালোমানুষের দেশটা তাঁদের বিষাদময় লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে স্বাধীন সুন্দর এক দিনের আশায় বসে থাকত বছরের পর বছর।

# একটি অসম্ভব আশার উপাখ্যান



নবম মোমের আলো জ্বলছিল ঘরে। রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড নতজানু হয়ে বিছানার পাশে বসে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছিলেন। ঘরের চতুর্দিকে রাজ্যের মন্ত্রী, ধর্মযাজক ও রানীর সহচরীরা কাঠপুতুলের মত দাঁড়িয়েছিলেন সকলে শোকে কাতর হয়ে বিষণ্ন মনে শেষ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আর সেই পরম রূপবতী রানী ফিলিপ্পা তখন মৃত্যুশয্যায় শুয়েছিলেন।

শুধু কেবলমাত্র একজনের চোখের দৃষ্টি জ্বলছিল, বুকের ভিতর গবম নিঃশ্বাসটি ঠেলে ঠেলে উঠছিল। তার দৃষ্টি নতজানু সম্রাটের সুন্দর মুখের উপর স্থির হয়ে ছিল। তার সেই আশায় উদ্দীপ্ত দৃষ্টি ঐ পরম রূপবান, উচ্ছল স্বভাবের, আটান্ন বছরের—প্রায়-প্রৌঢ় সম্রাটেব দিকে তাকিয়ে কী যেন হিসেব কষছিল মনে মনে। যদিও সে জানত এ অসম্ভব, তার মত একজন নগণ্য নিরক্ষর দাসীর পক্ষে সম্রাটের প্রেমিকা হবার আশা নিতান্তই পাগলামি। সে আবার

এটাও ভাবছিল, কত অসম্ভব ঘটনাই তো পৃথিবীতে সম্ভব হয়, আর তা ঘটে বলেই তো মানুষ নিরন্তর অসম্ভব আশার পিছনে ছুটেছে। আর পুঁজি বলতে তো ওর কেবলমাত্র রঙীন চটুল যৌবন আর মোহময় মুখশ্রী। মনে মনে এক কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করে তারপর অ্যালিসি পেরারাস্ সকলের অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এরপর কয়েকটি দিনের মধ্যে অসম্ভব পালটে গিয়ে যেন বড় নীরব আর বড় রহস্যময় হয়ে গেল অ্যালিসি। তারপর সেই ভয়ংকর রাত্রিটা এল। সেই রূপবতী রানী তাঁর চল্লিশ বছরের পরম শান্তিময় বিবাহিত জীবন, ব্ল্যাক-প্রিন্সের মত জাতীয় নেতার সম্ভ্রমযুক্ত পুত্র ও অন্যান্য ছটি পুত্র-সন্তান এবং পাঁচটি কন্যাকে রেখে চোখ বুজলেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠলেন। রাজ্যের সকলে বলাবলি করল, এইবার প্রাসাদের সুন্দর আলোটি নিবল। রানীর জন্য বেদনায় তাদের মন টনটন করে উঠল। বিপুল রাজকীয় সমারোহে যেদিন রানীর কবর দেওয়া হল, সেদিন সমস্ত রাজ্যে একটিও মানুষের মুখে উজ্জ্বলতা দেখা গেল না, বরং এক পবিত্র শোকে তাঁরা সকলে রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে অশ্রুবর্ষণ করলেন।

সমস্ত রাজ্যের মধ্যে বুঝি কেবলমাত্র অ্যালিসির চোখ-মুখেই এক অসম্ভব উজ্জ্বলতা দেখা গেল সেদিন, তার উদ্দীপ্ত দৃষ্টি আশায় আরো প্রখর হয়ে উঠল।

তারপর কয়েকটা দিন রাজা এডওয়ার্ডকে আর রাজসভায় পাওয়া গেল না। শোকে মুহ্যমান রাজা এডওয়ার্ডকে দেখা গেল প্রাসাদের ঘরে ঘরে অশান্ত পায়ে ঘুরে বেড়াতে। ঘরে ঘরে মৃত রানীকেই যেন খুঁজে ফিরতে লাগলেন তিনি। কিছুতেই তিনি যেন রানীর মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছিলেন না। ক্রমশ এডওয়ার্ডের আচরণ প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

আর রাজার সেই উন্মাদ শোকাভিভূত অবস্থার সুযোগ নিল যেন অ্যালিসি। ছায়ার মত সে কেবল অনুসরণ করতে লাগল রাজাকে।

প্রথম দিকে অ্যালিসির ব্যবহার এডওয়ার্ডের চোখে ধরা পড়ল না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শোক স্মৃতি হয়ে এল রাজার মনে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল সে। ক্রমশ অ্যালিসি রাজার দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। রাজা দেখলেন, খাবার টেবিলে তাঁর প্রিয় খাবারগুলো সাজানো, পছন্দমত পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক-ঠিকভাবে হাতের কাছে সাজানো আছে। ঠিক যেমন থাকত ফিলিপ্পার সময়। নতুন করে রানীর জন্য শোক জেগে উঠল তাঁর আর ঐ রূপবতী দাসীটিকে একান্তই প্রয়োজনীয় বলে বোধ হল।

অ্যালিসি বুঝল সব। তার সাহচর্যের মাত্রাটা বেড়ে গেল ক্রমশ, আরো নিপুণতার সঙ্গে সে রাজার ব্যক্তিগত কাজগুলো করতে লাগল। এডওয়ার্ড দেখলেন, সর্বক্ষণ অ্যালিসি আছে তাঁর পাশে পাশে। কখনও বিশ্রাম নেই, কোনো বিচ্যুতি নেই, যেন পরম নিষ্ঠাভরে দাসীটি তাঁর মনোমত কাজগুলো করে চলেছে মুখ বুজে। শুধু কাজের নিপুণতাই নয়, মেয়েটির মধ্যে তিনি যেন সৌন্দর্য, বুদ্ধি আর সততার সম্মিলন দেখলেন। অ্যালিসির প্রতি তিনি যেন এক উষ্ণ আন্তরিকতা অনুভব করলেন মনে মনে, বড়ই রমনীয় বলে মনে হল মেয়েটির সাহচর্য।

চিন্তা করলেন, কীভাবে এই নিপুণ সাহচর্যের পুরস্কার দেওয়া যায় দাসীটিকে। ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল সন্তানহীন আত্মীয়ের সম্পত্তিটা তো মালিকানাহীন হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘকাল। অতএব কোনো দ্বিধা না করে মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তিটাই অ্যালিসিকে তার কাজের পুরস্কারস্বরূপ দিয়ে দিলেন এডওয়ার্ড

এই সহসা পুরস্কার প্রাপ্তিতে কিন্তু বিচলিত হল না অ্যালিসি। কুয়াশার মত একটি সূক্ষ্ম হাসি কেবল তার ঠোঁট ছুঁয়ে চোখের তারা স্পর্শ করল। সে যেন জানত, এই রকম ঘটবে। সে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল রাজার, ওর উপস্থিতির উষ্ণতা যেন এডওয়ার্ডকে

মাতাল করে দিল। তাঁর প্রৌঢ় রক্তে উন্মাদনা এনে দিল। ফলে খুব দ্রুত সমাজের নীচু তলার অধিবাসী, গ্রামের নগণ্য তাঁতির সেই কন্যাটির সততায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে এক নতুন কর্মভার দিলেন। বিশাল বিশাল সম্পত্তির সব উত্তরাধিকারীদের, সব পিতৃমাতৃহীন নাবালকদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করলেন তিনি অ্যালিসির হাতে।

এতোতেও কিন্তু অ্যালিসির মন ভরল না। কি এক সীমাহীন ধন-সম্পত্তির লোভ তাকে কিছুতেই তৃপ্ত হতে দিল না। বরং বেড়ে গেল তৃষ্ণা, নেশা ধরল ধন-সম্পত্তির। বুঝি এই তৃষ্ণার কোনো শেষ নেই। রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডকে হাতের মুঠোয় পেতে হবে, পেতে হবে বিপুল ধন-সম্পত্তি। অ্যালিসি ছটফট করে বেড়াতে লাগল। রাজার সঙ্গে তার ব্যবহার বাধা-বন্ধনহীন হয়ে উঠল ক্রমশ, রমণীর সকল প্রকার মোহময় আবেশ দিয়ে সে আবৃত করতে চাইল এডওয়ার্ডকে। পরিচিতদের কাছে বড় নির্লজ্জ আর দৃষ্টিকটু বলে মনে হল অ্যালিসির এই জাতীয় আচার-আচরণ। অনেকে আবার কাছে গিয়েও অভিযোগ করল সরাসরি। কিন্তু কোনো ফল ফলল না। অ্যালিসির প্রতি আন্তরিক প্রেমে তিনি নিমজ্জিত হয়ে গেছেন তখন। প্রাসাদের সকলে লক্ষ করল, রাজার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে আছে অ্যালিসি, মুহূর্তের জন্য তাকে দৃষ্টি থেকে ছাড়তেও যেন কষ্ট হয় এডওয়ার্ডের। তাদের চোখে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হল ঘটনাটা, অবিশ্বাস্য লাগল রাজার ঐ নিরক্ষর গ্রাম্য দাসীটির প্রতি উন্মত্ত প্রেম ও মোহ। আর যতই দিন গেল, অ্যালিসি পুরোপুরিভাবে গ্রাস করে ফেলল রাজাকে। সে যেন নর্মসহচরী হতে হতে ক্রমশ কর্মসহচরীও হয়ে গেল। ভোর বেলাতেও তাকে দেখা যেতে লাগল রাজার কাজ করবার ঘরে। একটা ডিভানের উপর গা এলিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে থাকত সেখানে। যতক্ষণ রাজা সরকারী কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, ততক্ষণ অ্যালিসিও গা এলিয়ে শুয়ে থাকত, তার

এলানো উত্তপ্ত শরীর থেকে এক মাদক গন্ধ এসে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে দিত রাজাকে। চঞ্চল পায়ে আসন ছেড়ে উঠে আসতেন এডওয়ার্ড, হাঁটু ভেঙে বসতেন ডিভানটার পাশে, সলজ্জ একটু হেসে মুখটা রাজার দিকে তুলে ধরত অ্যালিসি, নিজের তপ্ত ওষ্ঠদুটি দিয়ে অ্যালিসির ওষ্ঠদুটি চেপে ধরতেন রাজা। এদিকে প্রাসাদের বাতাসে অ্যালিসি কিন্তু অশুভের গন্ধ পেয়েছিল, বেশ স্পষ্টভাবেই সে টের পেয়েছিল, রাজার সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গ মেলামেশা কেউই ভালো চোখে দেখছে না। বরং সকলের দৃষ্টিতে এক ঈর্ষা ও ঘৃণার আগুন জ্বলছে। অতএব একমাত্র আশ্রয়স্থল রাজার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটাতে লাগল। আর একদিন ঐ ঘরে ডিভানে শুয়ে শুয়েই তার নতুন একটি সম্পত্তি লাভ হয়ে গেল। হার্টফোর্ডশায়ারের অমন বিশাল সম্পত্তিটাও সে প্রায় স্বল্পমূল্যেই রাজার অনুমতিতে এক কৃষকের কাছ থেকে কিনে নিল।

'কিন্তু না', তবুও ধন-সম্পত্তির তৃষ্ণা মিটল না অ্যালিসির, গোপনে দুজন অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশে ইউরোপের সমস্ত মদ, ফল আর মাংস ইত্যাদি রপ্তানির ভার একচেটিয়া করে নিল সে। অর্থের নেশা ওকে এমন মাতাল করে তুলল যে, সকল খাদ্যবস্তুর মূল্য এমন বাড়িয়ে দিতে বাধ্য করল, যাতে গ্রামাঞ্চলে এবং বড় বড় শহরেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এডওয়ার্ড এ-সব দেখেও উপেক্ষা করে গেলেন। অ্যালিসির প্রেম তাঁকে মোহাবিষ্ট করে রাখল আর ধন-তৃষ্ণায় উন্মাদ অ্যালিসি জাল, জুয়াচুরি ও নোংরামিতে নিজেকে ডুবিয়ে দিল ক্রমশ। দিনের পর দিন হোয়াইটহল প্রাসাদে তার গোপন সভা বসত, বিভিন্ন সব মতলববাজ, অসাধু ব্যবসায়ীরা সেখানে তার হাতে টাকার তোড়া দিয়ে যেত। অ্যালিসি ছিল তাদের সবচেয়ে শক্ত খুঁটি তারা জানত, কোনো কাজই অসাধ্য নয় তার পক্ষে। অ্যালিসির ক্ষমতার সীমা প্রায় আকাশ স্পর্শ করেছিল তখন।

কাজের সময় দেখা যেত সে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে হাইকোর্টে গিয়ে বিচারকদের আসনের পাশে আসন নিয়েছে। রাজার নাম করে, ভয় দেখিয়ে সে বিচারকদের বাধ্য করত তার সাঙ্গপাঙ্গদের পক্ষে রায় দিতে। রাজ্যের প্রায় সকলেই এ-কথাটা জেনে গিয়েছিল যে, অ্যালিসিকে ঘুষ দিলে যে কোনো কাজই করা যায়। ফলে হোয়াইট-হলের সভায় প্রতিদিন লোক সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল।

অ্যালিসির ধন-সম্পদের তৃষ্ণা যে কোন্‌দিন মিটবে, তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল না। বরং দেখা গেল, যে-কোনো সম্পত্তিই তার চোখে লোভনীয় বলে মনে হত, সেটিকেই সে যে-কোনো উপায়ে কিনে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। রাজার কোষাগার থেকেও সে ছলো নাতায় টাকা ধার নিতে শুরু করল। কারণ, সে এটা স্পষ্ট ভাবে জেনে গিয়েছিল যে, এডওয়ার্ড কিছুতেই তাকে না বলবে না। ফলে চাওয়ার মাত্রাটা দিন দিন তার বেড়ে যেতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়েই ঘটনাটা জানা গেল। সকলের চোখে এ-সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অ্যালিসি গর্ভবতী হয়েছে। এবং তার সন্তানের পিতৃত্বের জন্য দায়ী একমাত্র রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড।

অ্যালিসি কিন্তু প্রথমে কিছুদিন এ ব্যাপারে মুখ খুলল না। যেন ঘটনাটা কিছু নয়। পরে ক্রমশ তার শরীর যখন খারাপের দিকে যেতে শুরু করল, অ্যালিসির মনে আবার সেই লোভ, সেই নোংরামি ফিরে এল। সে রাজার কাছে হ্যামারস্মিথে একটা প্রাসাদ চেয়ে বসল নিজের ব্যবহারের জন্য। সকলে আশা করেছিল, অ্যালিসি স্বাভাবিক ভাবেই রাজার কাছে বিবাহিত পত্নীর সম্মান দাবী করবে, কিংবা সন্তানের জন্য চাইবে কোনো রাজকীয় খেতাব। কেবলমাত্র একটি প্রাসাদের দাবি জানিয়ে অ্যালিসি যেন সকলের চোখে এক সন্দেহ ও রহস্যের মূর্তি হয়ে গেল। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না অ্যালিসি সত্যি কী চায়। শুধু ধনসম্পদ, প্রতিপত্তি না অন্য কিছু।

আর যত দিন যেতে লাগল তার আচার আচরণও আরো নির্লজ্জ,

আরো ভয়ংকর হয়ে দেখা দিল। সে বাধা-বন্ধনহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল চতুর্দিকে। একবার তো স্মিথফিল্ডের বাৎসরিক একটি অনুষ্ঠানে কেলেঙ্কারি করে বসল। ঐ অনুষ্ঠানের চিরকালের একটা প্রথা ছিল যে, রাজ্যের সমস্ত উঁচু মহলের মহিলাদের লণ্ডনের টাওয়ার থেকে মিছিল করে পায়ে হেঁটে স্মিথফিল্ডের মাঠে গিয়ে পৌঁছতে হবে। ঐ মিছিলে রাজ-পরিবারের মহিলাদেরও হেঁটে যাবার নিয়ম ছিল। কিন্তু সেবার অ্যালিসি সেই নিয়ম ভঙ্গ করল। অনুষ্ঠানের দিন তাকে দেখা গেল, রাজার পাশে ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে বসে সে মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে মহিলাদের মধ্যে একমাত্র অ্যালিসিই এলো গাড়িতে চেপে। রাজ্যের উচ্চ তলার অন্যান্য মহিলারা সব পায়ে হেঁটে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রথামত মাঠে এলেন। এক সপ্তাহ ধরে তারপর সেই অনুষ্ঠান চলল আর সেই পুরো সাত দিনই অ্যালিসি নিত্য নতুন পোশাকে বহুমূল্য হীরে জহরতের মালা গলায় দুলিয়ে, গাড়িতে চেপে মাঠে আসত অ্যালিসির সেই নির্লজ্জ ব্যবহারে দুর্নাম রটল এডওয়ার্ডের নামে প্রেমে অন্ধ, মেরুদণ্ডহীন এডওয়ার্ড লোকের চোখে হেয় হয়ে গেলেন। রাজপুত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল, রাজার শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে এসে সৎ পরামর্শ দিয়ে গেলেন। কিন্তু বৃদ্ধ হতভাগ্য প্রেমিক এডওয়ার্ডের চৈতন্যোদয় হল না। বরং তাঁর প্রশ্রয় পেয়ে অ্যালিসি ইংলণ্ডের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মহিলা হয়ে উঠল।

আর ক্রমেই রাজার প্রতি অ্যালিসির ব্যবহারও বদলে যেতে লাগল। সে অবহেলা করতে শুরু করল তাঁকে। আগের মত এডওয়ার্ড আর অ্যালিসিকে সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে পেতেন না, রাত্রির আসরেও অ্যালিসির অনুপস্থিতি ঘটতে লাগল ক্রমশ। রাজা তাকে ডাকতে লোক পাঠালেও অ্যালিসি সব সময় এসে উপস্থিত হত না আর। কাছে এলেও এডওয়ার্ড অ্যালিসির সাহচর্যে সেই পুরোনো প্রাণের সাড়া বা উষ্ণতা খুঁজে পেতেন না। বরং তিনি আলিঙ্গনের

জন্য হাত বাড়ালে, চুম্বনের জন্য ঠোঁট পেতে ধরলে অ্যালিসি ছিটকে দূরে সরে গিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে শুরু করে দিত। চাপা ভয়ংকর এক হিংস্র গলায় ফিস ফিস করে উঠত,

'বুড়ো·······তুমি একটা বুড়ো।'

করুণাবশত কখনও আবার ধরা দিয়েই দূরে সরে যেত। আর উন্মাদ, এডওয়ার্ডের অধীরতার সুযোগে সে নিত্যনতুন সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিত। রাজার প্রতি এই অবহেলার অন্য একটা গূঢ় কারণ ছিল তার। এই সময় অ্যালিসি তরুণ বয়স্ক, রূপবান, সাধারণ একজন নাইট স্যার উইলিয়াম অফ উইণ্ডসরের প্রেমে পড়েছিল। এই নতুন প্রেমিকটির জন্য সে রাজার কাছ থেকে আয়ারল্যাণ্ডের লর্ডের পদটি আদায় করে নিয়েছিল। উইলিয়াম সেখানে নিত্য নতুন কর বসিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করে অ্যালিসির কাছে পাঠিয়ে দিত। এই নতুন প্রেমের উন্মাদনায় অ্যালিস প্রায় জগৎ সংসার ভুলে যেতে শুরু করল।

আর গোপনে অ্যালিসির প্রতি জনসাধারণের দীর্ঘদিনের জমানো ঘৃণা, ক্রোধ পুঞ্জীভূত হতে লাগল। রাজপুরুষদের মধ্যেও গোপন সব বৈঠক বসতে শুরু করল। গ্রামাঞ্চলেও এই রমণীটিকে কেন্দ্র করে বিরুদ্ধ দল গঠিত হতে লাগল সমস্ত কিছুই এত গোপনে ঘটতে লাগল যে, অ্যাসিলি, তার প্রেমিক বা এডওয়ার্ড প্রথম দিকে সেই অসন্তোষের কিছুই টের পেলেন না। পরে সেই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে একদিন বিস্ফোরণ ঘটাল। ১৩৭৬ সালে পার্লামেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশন বসল ঐ অ্যালিসি পেরারাসের বিরুদ্ধে। অ্যালিসির বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রধান অভিযোগ উঠল যে, সে প্রেতসিদ্ধ, বিভিন্ন নিষিদ্ধ সব বশীকরণের ব্যবহারের বিষয় সে চর্চা করে থাকে, নচেৎ মাত্র চার বছরের মধ্যেই কি করে অমন সতেজ, বলিষ্ঠ রাজাকে সে বৃদ্ধ, আসক্ত করে তুলতে সমর্থ হয়। অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ হ্যামার-স্মিথের প্রাসাদ থেকে সৈন্য দিয়ে অ্যালিসির সেই প্রধান উপদেষ্টা,

আশ্রিত তান্ত্রিক সাধুটিকে ধরে আনা হল এবং সাধুটিকে পুড়িয়ে মারার ভয় দেখালেই সে তাদের সমস্ত দোষ স্বীকার করল। অ্যালিসির সঙ্গে স্যার উইলিয়াম অফ উইণ্ডসরের যোগাযোগ বিষয় নিয়েও পার্লামেণ্ট অনুসন্ধান চালাল। এবং রাজাকে সুস্থ স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য পার্লামেণ্ট ঘোষণা করল, অ্যালিসি স্যার উইলিয়ামের বিবাহিত পত্নী অতএব তার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রক্ষা করা রাজার পক্ষে নিতান্তই গর্হীত কর্ম। অতএব অ্যালিসিকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই তাঁর উচিত।

অ্যালিসির এই বিবাহের সংবাদে রাজা প্রথমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, পরে সংবাদটা ভিত্তিহীন বলে অবিশ্বাস করলেন, তিনি যেন কিছুতেই প্রাণে ধরে সংবাদটাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু জনসাধারণের বিদ্বেষ তার মনে ভয় ধরাল অতএব বৃদ্ধ, ভীত এডওয়ার্ড গীর্জায় গিয়ে প্রধান ধর্মযাজকের সামনে নতজানু হয়ে বসলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর একসময় বললেন,

'অতঃপর আমি আর ঐ আলিসি পেরাবাসের মুখদর্শন করব না বলে প্রতিজ্ঞা করছি। হে প্রভু, তুমি আমাকে শক্তি দাও।'

বলতে বলতে তাঁর গলাটা ভেঙে গেল, বুকের ভিতর তিনি যেন এক অসীম শূন্যতা অনুভব করলেন। আর কথা শেষ করেই তিনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। শরীরটা তাঁর কেমন করে উঠল যেন হঠাৎ।

প্রজারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এতদিনে। পার্লামেণ্ট অ্যালিসিকে নির্বাসন দণ্ড দিল; তার ধনসম্পত্তি বেচে দেওয়া হল অন্যের কাছে ন্যায্য দামে জনসাধারণ অ্যালিসির সাঙ্গপাঙ্গদের ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। আর আতঙ্কিত অ্যালিসি দুটি শিশুপুত্রের হাত ধরে বিদেশে পালিয়ে গেল।

কিন্তু এতোতেও কী এই অসম্ভব নাটকের সমাপ্তি ঘটল? বরং

বলা যায়, ক্ষণিক বিশ্রাম দিয়ে পুনরায় নতুন উদ্যমে যেন নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু হল।

নিজের মুখে গীর্জায় শপথ বাক্য উচ্চারণ করে প্রাসাদে ফিরে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড সেই যে বিছানা নিলেন, সহজে আর তাঁর শরীরের উন্নতি হল না। ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগল তাঁর শরীর নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠল। কিছুতেই তিনি অ্যালিসিকে ভুলতে পারছিলেন না। বরং তাঁর সারা মন, সারা অস্তিত্ব জুড়ে অ্যালিসি বিরাজ করছিল বিষণ্ণ, কাতর এডওয়ার্ড বিচ্ছেদের জ্বালায় কেঁদে ফেললেন।

আর এদিকে আতঙ্কিত অ্যালিসি নির্বাসনে অস্থির হয়ে উঠল ধন-সম্পদের কথা মনে পড়লে কিছুতেই ঠিক রাখা যায় না নিজেকে, বুকটা হুহু করে ওঠে, চোখে জল আসে। যত সব পাজি নচ্ছারের দল, একবার যদি কোনো রকমে সে ফিরে যেতে পারে স্বদেশে, তারপর দেখে নেবে সকলকে মনে মনে সঙ্কল্প আঁটে সে কখনও সখনও এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে তার। মনটা ক্ষণিকের জন্য ছলছল করে ওঠে। কিন্তু বেশি করে মনে পড়ে তার ঐসব দামী দামী হীরে জহরতগুলোর কথা শেষ সম্বল বিক্রি করেও বিশ্বাসী সব গুপ্তচর নিয়োগ করেছে, সুযোগ এলেই তারা খবর দেবে। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো বড় দীর্ঘ, বড় নিষ্ঠুর মনে হয় তার। উইলিয়মকেও মনে পড়ে আহা বেচারা! অস্থির অ্যালিসি সংবাদের আশায় কান পেতে থাকে।

আর অন্যদিকে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে আসে আর সেই সময় পার্লামেন্টের দরজাও বন্ধ হয়ে যায় খবরটা পাঁচকান হয়ে নির্বাসিত অ্যালিসির কানে গিয়েও পৌঁছায় শেষ পর্য্যন্ত। সে আর দ্বিরুক্তি না করে স্বদেশের দিকে যাত্রা করে ছদ্মবেশে গোপনে সে এক রাত্রে রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হয়। তারপর প্রাসাদের সমস্ত লোকজনকে জাগিয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢোকে এডওয়ার্ডের ঘরে। অসুস্থ, ক্লান্ত রাজা চোখ মেলে তাকান। দৃষ্টিটা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এলে দেখতে পান, তাঁর বিছানার

পাশে মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে তাঁর প্রিয় অ্যালিসি অশ্রুবর্ষণ করছে। আনন্দে তাঁর বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আসতে চায়। অসহ্য আবেগে আলিঙ্গনের জন্য কম্পিত হাত দুটো তুলে ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন এডওয়ার্ড। কী আশ্চর্য্য রূপময়ী হয়ে উঠেছে অ্যালিসি।

আর তারপর শুরু হয় অ্যালিসির গোপন প্রতিশোধ গ্রহণ যে-সব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তার অন্তরঙ্গ সাঙ্গপাঙ্গদের হত্যা করেছিল, অ্যালিসির ভাড়াটে ঘাতকরা গিয়ে এক-এক করে তাদের হত্যা করে, জীবন্ত পুড়িয়ে মারে কাউকে কাউকে। রাজার জীবিত অবস্থায় আর কারো পক্ষে সাহস হয় না অ্যালিসির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে।

তারপর একদিন রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। অ্যালিসি ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে রাজার আংটি ও অন্যান্য মূল্যবান রত্নগুলো এক-এক করে এডওয়ার্ডের গা থেকে খুলে নিয়ে নিজের হাতব্যাগের মধ্যে ভরে চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে রাজপরিবারের মহামূল্যবান সব রত্নরাজি ব্যাগ ভর্তি করে নেয়, তারপর নিঃশব্দ পায়ে শয়ন কক্ষের গোপন চোরা পথ দিয়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসে।

১৪০৭ সাল পর্যন্ত, রাজার মৃত্যুর পরেও দীর্ঘ তিরিশ বৎসর বেঁচে ছিল অ্যালিসি, উন্মাদ অবস্থায়।



# ঘূর্ণাবর্ত

সাইবেরিয়া। নামটা মনে এলেই আতঙ্কে কেঁপে ওঠে শরীর, নানা ভয়ংকর স্মৃতি আসে ভিড় করে। সেই জনমানবহীন মাইলের পর মাইলব্যাপী দিগন্ত-ছড়ান ভূমি আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন বন আর পর্বতের রহস্যময় বিস্তার। যেন এক শীতল মৃত্যুর রাজ্য।

সালটা ১৯১৪। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুদ্ধের তিন হাজার জার্মান ও তুরস্কের বন্দীকে সেদিন সাইবেরিয়া বন্দী শিবিরে পাঠান হয়েছিল। কারাস্ক্ নোয়াবাস্ক্ শহরের উত্তরে একখণ্ড উঁচু জমির উপর, পাথরের তৈরী সারিসারি ঘর স্যাঁৎসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে ছিল বন্দী শিবিরটা। দু দল সৈন্যের কড়া পাহারা ছিল সব সময়ের জন্যে।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী শিবিরের ভয়াবহতাটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল বন্দীদের। প্রায় অনাহারেই রাখা হয়েছিল তাদের প্রথম কয়েক সপ্তাহ। ক্ষুধার জ্বালার থেকেও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছিল

এশিয়াটিক টাইফাস রোগ। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ কয়েক-শ' বন্দী সেই রোগে ও অনাহারে মারা গিয়েছিল।

বন্দী জীবনের এই ভয়ংকর অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করে ক্রমশ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন একজন যুদ্ধবন্দী জার্মান মেজর এ. ডি. ক্রেনজ মস্কি। কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে কাটিয়ে ফিরে এসেও শরীরের দুর্বলতাটা তার ভালো করে কাটছিল না কিছুতে। হাঁটাচলা ওঠা বসা করবার সময়ও দুর্বলতায় শরীরটা পাক খেয়ে উঠত। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করত আর মনে হত এইবার বুঝি শরীরের কাঠামোটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, নয়ত নিঃশ্বাসটি যাবে থেমে। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থাকাও যায় না অনির্দিষ্টকাল। অথচ উপায়ই বা কি? কী করেই বা পালানো যাবে এই দুর্ভেদ্য জায়গাটা থেকে। ঐ দিগন্ত ছড়ানো ভূমিতে না ওঠে কোনো শব্দ, না আছে মানুষজনের বসতি। ধূসরনীল কুয়াশার ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে কেবল গোল গালাটে অশরীরী সূর্যের আলো আসে কখনো সখনো। সমস্তক্ষণ কেবল শীতল হাওয়ার এলোমেলো ঘূর্ণি চলে। এর মধ্য দিয়ে কোন পথেই বা যাওয়া যাবে? ভাবতে গেলে হতাশায় মন ভারি হয়ে আসে ভার, শরীরটা দুর্বল লাগতে থাকে।

কিন্তু তবু কিছুতেই যেন দমছিলেন না তিনি, বরং পূর্ণ উদ্যমে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন

ইতিমধ্যে মস্কি যদিও ভুবনের বন্দীদের কাছ থেকে তাদের ভাষাটা মোটামুটি শিখে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বলা যায় না কখন হয়ত এই ভাষা শিক্ষাটা কাজে লেগে যেতে পারে। আর হাতপা গুটিয়ে অকর্মণ্য হয়ে কতদিনই বা থাকা যায়। মনের মধ্যে বন্দী শিবির থেকে পালানোর চিন্তাটা সবসময় নড়েচড়ে বেড়ায়। সবসময় সতর্ক হয়ে থাকে সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টি। আর অবশেষে ঐ ভাষা শিক্ষার মাধ্যমেই একদিন মাস্কির আলাপ হল এক বন্দীর সঙ্গে। মানুষটি সারাদিন চুপচাপ মাটির দিকে চোখ রেখে অলসভাবে বসে

থাকে ঘরের ভেতর আর মাঝে মাঝে হঠাৎ অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কী যেন বিড়বিড় করে বলে ওঠে। অন্যসময় বেশ চুপচাপ থাকে। প্রথম প্রথম ঐ নীরব মানুষটাকে এড়িয়েই চলতেন মাস্কি। কিন্তু একদিন একটা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষটির কাছাকাছি এসে পড়লেন তিনি। ছেঁড়াছেঁড়া আলাপও হল কিছু। আর একদিন কথা প্রসঙ্গে মাস্কি রাশিয়ান বন্দর বাকুতে মানুষটির একজন প্রতিপত্তিশালী হোটেলওয়ালা বন্ধুর কথা শুনলেন। বন্ধুটি নাকি ভীষণ স্বদেশপ্রেমিক আর সে ইচ্ছে করলেই যে কোন লোককেই যখন তখন পার্শিয়ায় চালান করে দিতে পারে অত্যন্ত সহজেই। কথাটা মনে লাগল মাস্কির যদি কোনোরকমে একবার বাকুতে পৌঁছান যায়, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। সব কিছু চিন্তা করে একদিন মাস্কি সাহস করে ঐ নীরব মানুষটিকে নিজের মনের কথা খুলে বলতেই মানুষটা প্রথম কয়েকবার ঘাড় নাড়ল। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে এক খণ্ড সাদা কাগজ সংগ্রহ করে বসে গেল বন্ধুকে মাস্কির পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখতে চিঠি লেখা শেষ করেই আবার সে বন্ধুর বন্ধু সুলেমানের বিষয়েও মাস্কিকে যথাসম্ভব খবর দিয়ে দিল যদি কোনো কারণে ঐ হোটেলওয়ালা বন্ধুটির সঙ্গে দেখা না হয় বা তার কাছ থেকে প্রার্থিত সাহায্য না পাওয়া যায় তাহলেও সুলেমানের সঙ্গে দেখা করলেই মাস্কির অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কারণ সুলেমান একজন মানুষ, যে কখনও কাউকে কোনো ব্যাপারেই নিরাশ করে না আর তার ক্ষমতাও প্রচুর।

যেন অন্ধকারের মধ্যে একটু আশার আলো দেখতে পেলেন মাস্কি। তারপর অন্য দুজন বন্ধুর সঙ্গে বন্দী শিবির থেকে পালানোর প্ল্যান আঁটলেন কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণের পর মোটামুটিভাবে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে পলায়নের প্ল্যানটা ঠিক করা হল। প্রথম পর্যায়ে বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে কয়েক দিন কারাস্ক্ নোয়ারাস্ক্ শহরের আশে পাশে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে;

পরে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সাইবেরিয়া এবং রাশিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে বাকুতে ; তারপর বাকু থেকে পালিয়ে যেতে হবে পার্শিয়ায়। এই তিনটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি পদে পদে আছে বিপদের আশংকা, ধরা পড়ে অত্যাচারিত হবার কষ্ট। এই যাত্রার বেশীর ভাগ নির্ভর করছে সৌভাগ্যের উপর। ভাগ্যের সাহায্য না পেলে প্রথম পদক্ষেপেই আসবে মৃত্যু, আসবে অমানুষিক অত্যাচার। বিশেষতঃ পলায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রেন যাত্রাটাই সবচেয়ে মারাত্মক। কয়েক সপ্তাহ রাশিয়ান যাত্রীদের সঙ্গে কাটাতে হবে সকাল-সন্ধে-রাত্রি। অথচ রাশিয়ান ভাষাটা একদমই জানেন না মাস্কি। বন্ধু দুজন কাজ চালানো গোছের জানেন।

এই সময় একদিন একটা সুযোগ জুটে গেল মাস্কির। একজন বৃদ্ধা ইহুদী অনেক দূর থেকে বন্দী শিবিরে প্রতি সপ্তাহে খাবার-দাবার বিক্রি করতে আসত। মাস্কি গিয়ে গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা খুলে বললেন। কয়েক সপ্তাহ কথাবার্তা চলার পর তিনশ রুব্‌লের বিনিময়ে মহিলাটি মাস্কিকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল। এই বন্দী শিবির থেকে তাকে বের করে নিয়ে বাকতে পৌঁছে দেবে সে। আর দু' তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। দুজন বন্দী জার্মান অফিসার এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। একজন মাস্কির পোশাক পরিধান করলেন অন্যজন আঠারো বছরের ছোটখাটো নবালক বন্দী উল্‌ফের পোশাক পরে নিলেন।

তারপর দেখতে দেখতে পলায়নের জন্য নির্দিষ্ট রাত্রিটা এসে গেল। অন্য দিনের চেয়ে যেন আরো ঘন হয়ে নামল কুয়াশা আর অন্ধকার। ঝিরঝির বৃষ্টিও যেন নামল সময় বুঝে, আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেলেন তাঁরা দুজন, আচমকা অন্ধকারের মধ্যে ডেকে উঠল দু' একটা কুকুর। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা বন্দী শিবিরের সেপাইদের গলা অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট শব্দ

শে উঠল। মাটিতে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন তাঁরা। প্রতি মুহূর্তে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হচ্ছে, একটু অসতর্ক হলেই যে কোনো দিক থেকে ছুটে আসবে বন্দী শিবিরের সেপাইদের বন্দুকের গুলি, জ্বলে উঠবে আলো। পিচ্ছিল ঠাণ্ডা মাটির উপর হামাগুড়ি দিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তাদের। একসময় একটু একটু করে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে এগুতে বন্দী শিবির ছাড়িয়ে ফাঁকা বিস্তীর্ণ মাঠে নেমে পড়লেন তাঁরা। আরো খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলেন কিছুসময়। বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য রাখলেন বন্দী শিবির থেকে কোনো সাড়া ওঠে কিনা। তারপর ঘণ্টাখানেক চুপচাপ উৎকর্ণ হয়ে বসে থেকেও কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না যখন, তখন তাঁরা গুটিগুটি পায়ে স্বাধীন মানুষের মত শহরের দিকে এগিয়ে চললেন দীর্ঘদিন বাদে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে শরীরটুটো কেমন ঝরঝরে লাগতে লাগল তাঁদের, আনন্দে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল প্রথমে। যেন সবকিছু নতুন আর অদ্ভুত লাগতে লাগল, বুকের ভেতর নতুন নিঃশ্বাস, চোখের ভেতর নতুন দৃষ্টি।

তারপর সারা রাত্রি এক নাগাড়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন তাঁরা সাইবেরিয়া রেল স্টেশনে। খুব বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না বুড়িকে। স্টেশনে ঢোকার মুখেই দলবল সমেত পাওয়া গেল তাকে, গোটা দুয়েক ছটফটে বাচ্চা আর ধূসর চেহারার একজন বৃদ্ধকে নিয়ে যাত্রী সেজে বসেছিল সে। উলফ্ বিদায় নিলেন স্টেশন থেকে। অন্য পথে এবার শুরু হবে তার যাত্রা।

ট্রেনটা এসে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। খুঁজেখুঁজে একটা নিরিবিলি নির্জন চতুর্থ শ্রেণীর গাড়িতে উঠে তৃতীয় শেলফে উঠে কম্বল মুড়ি দিয়ে মাস্কি শুয়ে পড়লেন বুড়োর নির্দেশ মত। বুড়ো নিজের আসন পাতল নিচের আসনে। বুড়ি বাচ্চাদের নিয়ে উঠল ভিন্ন কামরায়। তারপর এক এক করে যাত্রী বোঝাই হলে ট্রেনটা ছাড়ল

একসময়। বুড়ো তার বিষণ্ণ ভাঙা গলায় এক এক করে কামরার সহযাত্রীদের মাস্কির গুরুতর এক অসুখের কাহিনী শোনাল। শেষ আশায় রুগীকে নিয়ে মস্কোর পথে চলেছে সে—সেখানকার ডাক্তাররা যদি কোনো আশা দিতে পারে। নচেৎ আর কিছুই করবার নেই। অতএব তিনদিন তিন রাত্রি ধরে মাস্কিকে কম্বলমুড়ি দিয়ে নির্জীবের মত শুয়ে থাকতে হল। এমনকি ভরসা করে তিনি এ ক'দিনের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক চাপের জন্য একবারও উঠে ট্রেনের বাথরুমে যাবারও সুযোগ পেলেন না। কোনোরকমে দাঁতে দাঁত চেপে শরীর শক্ত করে শুয়ে থাকতে হল তাঁকে। তারপর একসময় কামরার যাত্রীরা যখন নেমে গেল তাদের গন্তব্যস্থানে, নিজের জায়গা ছেড়ে লাফ দিয়ে নামলেন মাস্কি। কোনো কথা না বলে সোজা ছুটে গেলেন বাথরুমের দিকে। বেশ কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে যখন ফিরে এলেন নিজের কামরায় তখন নতুন যাত্রীতে ভরে গেছে। আবার ট্রেন চললো। আবার সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে রুগীর ভান করতে হল মাস্কিকে।

সাতদিনের মাথায় ট্রেন পৌঁছুল চেলিয়বোনিস্কে। সাইবেরিয়া এবং রাশিয়ার প্রান্তসীমায় একটা স্টেশনে সমস্ত যাত্রীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করার জন্য কয়েক ঘণ্টা ট্রেনটা দাঁড়াল স্টেশনে। আর আতঙ্কে প্রায় আধমরা হয়ে রইলেন মাস্কি। এইবার এতদূর এসেও হয়ত নকল পাসপোর্টের জন্য ধরা পড়তে হবে তাঁকে! কিন্তু আশ্চর্য। একটা বাজে গোলমাল বাধিয়ে মাস্কিকে বাঁচিয়ে দিল বুড়ি। বাচ্চা দুজনকে নিয়ে চেঁচামেচি হই-হট্টগোল বাধিয়ে স্টেশনটা সরগরম করে তুলল সে। অতএব এই ছদ্ম গোলমালের সুযোগে মাস্কির নকল পাসপোর্টটা তেমন ভালো করে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেল না সরকারী অফিসারেরা।

আবার ছাড়ল ট্রেনটা। সামারায় ট্রেন বদল করে নতুন ট্রেনে চাপতে হল তাঁদের। এবার ট্রেন চলল দক্ষিণের দিকে ডন উপত্যকার মধ্য দিয়ে। আর পনেরোটা দিন নির্বাক হয়ে রুগীর মত কম্বল মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দিলেন মাস্কি। অবশেষে উজ্জ্বল আলোর কাসপিয়ান



৫

সমুদ্র দেখা গেল। কামরার কসাক সহযাত্রীরা সমুদ্র দেখে উল্লাসে সমস্বরে গান জুড়ে দিল—'কসাকদের মা ভলগা ও, মা ভলগা।' আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে অবশেষে ট্রেন পৌঁছুল বাকুতে।

সৌভাগ্য তাঁকে নির্বিঘ্নে এতদূর নিয়ে এসেছে, মাস্কির মনে হল, যাত্রার দ্বিতীয় অংশটাও ভালোয় ভালোয় কাটবে তাঁর। কিন্তু সহজেই ভুল ভাঙল। শহরে অনেক খুঁজে খুঁজে সেই হোটেল ওয়ালাটিকে পাওয়া গেল। হাসিখুশি গোলগাল ভালোমানুষের মত চেহারা। মাস্কি আর দেরি না করে শিবিরের সেই বন্ধুটির চিঠি বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে। চিঠিটা পড়তে পড়তেই কিন্তু হোটেল ওয়ালার চোখ মুখের চেহারা কেমন পাল্টে যেতে সুরু করল। গনগনে লালচে হয়ে উঠল মুখ, গালের পেশী গেল কুঁচকে আর চিঠিটা পড়া শেষ করেই সে উঠল চেঁচিয়ে। চীৎকার করে রাস্তার পুলিসকে ডাকতে শুরু করে দিল। ভয়ে বিস্ময়ে এক মুহূর্ত থমকে থেকেই পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন মাস্কি, আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করেই হোটেল থেকে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার ভিড়ে গা ঢাকা দিলেন।

কয়েকটা দিন তারপর গা ঢাকা দিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় সুলেমানকে খুঁজে বেড়াতে হল মাস্কিকে। এই পাগলের মত খোঁজার পর একজন সরাইওয়ালার কাছ থেকে আবছা মতন সুলেমানের খোঁজ পওয়া গেল। আর সরাইওয়ালার বাচ্চা ছেলের সঙ্গে একদিন সকালবেলা মাস্কিকে গিয়ে হাজির হতে হল একটা অফিসে।

সেই লম্বা বড় ঘরটায় প্রথম যে মানুষটাকে চোখে পড়ল তাকেই গিয়ে মাস্কি তার আনাড়ী তুরস্ক ভাষায় জিজ্ঞেস করে বসলেন সুলেমানের কথা। মানুষটা প্রথম কয়েক পলক মাস্কির অদ্ভুত পোশাকটার দিকে তাকালো, আপাদমস্তক জরিপ করল কয়েকবার তারপর গম্ভীর গলায় আচমকা বলে উঠল :

'নিজের ভাষায় কথা বল। কে তুমি ?'

'আমি···আমি একজন ফরাসী। কিন্তু অসুবিধায় পড়ে গেছি

হঠাৎ।' কোনো রকমে আমতা আমতা করে ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলেন মাস্কি।

'তোমার ভাষা আমি ঠিক বুঝি না তবে আমাদের অফিসে একজন ভদ্রমহিলা আছেন তিনি ফরাসী ভাষাটা ভালো জানেন। তাঁর সঙ্গেই কথা বল তুমি।' নম্র ভাষায় কথাটা বলেই ফোনটা তুলে দিলেন মাস্কির হাতে। আর ইতিমধ্যে কৌতূহলী হয়ে অফিসের অন্য অন্য লোকেরাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাঁর চারপাশে। ভয়ে আতঙ্কে সমস্ত শরীরটা হিম হয়ে গেল মাস্কির। তবুও সহজ ভাবে ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন তিনি ফোনের ভিতর। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ওপাশ থেকে অস্পষ্ট নারী কণ্ঠে শোনা গেল :

'কিন্তু তুমি তো ফরাসী নও। এমন বাজে উচ্চারণে কোনো ফরাসী তার মাতৃভাষা বলে না। সে যাই হোক তুমি ওখানে অপেক্ষা করো আমি যাচ্ছি।'

আতঙ্কে উত্তেজনায় নীরবে অফিসের চেয়ারে বসে ভদ্রমহিলাটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন মাস্কি। আর সেই আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর শরীর হিম হতে হতে যেন পাথর হয়ে গেল। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড দুর্বলভাবে বাজতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনে হতে লাগল এইবার বুঝি তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত মাস্কিকে উৎকণ্ঠার কাঁটায় বিঁধিয়ে রেখে ভদ্রমহিলা ও তাঁর মা এসে দেখা দিলেন। কোনো কথা না বলেই তাঁরা মাস্কিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অফিসের লম্বা ফাঁকা করিডোরটায় পা দিয়েই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত দ্রুত গলায় ফিস্‌ফিস্ করে মাস্কির কানের কাছে বলে উঠলেন :

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কে। জার্মান পলাতক বন্দী নিশ্চয়ই।'

নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে হল মাস্কিকে। তিনি ধরা

পড়ে গেছেন অতএব এই ভদ্রমহিলাদের কাছে সত্য গোপন করে আর কোনো লাভ নেই, যা হবার তাই হোক। এরপর ভদ্রমহিলা আর কোনো কথা বললেন না, শুধু নীরবে তাদের অনুসরণ করবার নির্দেশ দিলেন। করিডোরটা দিয়ে তারপর নীরবে কয়েক পা হেঁটে যাবার পরই ভদ্রমহিলা একটি নির্জন অংশে গিয়ে একটুকরো কাগজ মস্কির হাতে গুজে দিতে দিতে চাপা গলায়ই আবার বলে উঠলেন ঃ

'ত ড়াতাড়ি একটা গাড়ী ডেকে এই ঠিকানায় চলে যান।'

আর কথাটা শেষ করেই ভদ্রমহিলা দুজন করিডোরে একটা বাঁক নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সমস্ত ঘটনাটাই এত দ্রুত ভাবে ঘটল যে মাস্কি কোনো কিছু বুঝতে পারলেন না। এক মুহূর্তে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তাঁর যেন সম্বিত ফিরে এল। এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে অফিস বাড়িটা ছেড়ে নেমে এলেন তিনি রাস্তায়। তারপর একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেলেন একটা খালি গাড়ি। কোচোয়ানকে ঠিকানাটা বলেই গম্ভীর মুখে গাড়ীতে উঠে বসে পাশের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে নিজেকে রাস্তার লোকজনেব দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ফেললেন।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় গাড়া গিয়ে পৌছল এক সময়। বেশী হাঁকডাক করতে হল না, দরজার কড়াটা নাড়তেই সুলেমান নামধারী ব্যক্তিটি বেরিয়ে এলেন। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরেই আলোচনা করে পরদিন সকাল বেলায় পার্শিয়ায় যাবার একটা জাহাজে মাস্কির যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমলেন মাস্কি সেই রাত্রে।

পরদিন সুলেমানের সাহায্যে তিনি চেপে বসলেন 'ওডেসি' নামের এক অদ্ভুত জাহাজে। পলায়নের নতুন এক অধ্যায় শুরু হল মাস্কির।

দিন দুয়েক পর তাঁর জলযাত্রা শেষ হল। সুলেমানের বন্ধু ইব্রাহিম এর পর থেকে তাঁর যাত্রায় সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে আগে থেকেই তা ঠিক করা হয়েছিল। অতএব বিনা দ্বিধায় মাস্কি গিয়ে দেখা করলেন ইব্রাহিমের সঙ্গে। দিন-দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত যাত্রার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। পথপ্রর্দশক হিসাবে তিনজন তাতারকে ঠিক করা হল। বিশাল একটা ম্যাপ বিছিয়ে তাঁরা যাত্রাপথের সবচেয়ে সহজ ও সরল পথটা বুকিয়ে দিলেন মাস্কিকে। নির্দিষ্ট পথহীন মাগনাস্টেপা পেরিয়ে উঁচু উপত্যকার মধ্য দিয়ে কালো পাহাড়ের পাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছুতে হবে সাভেলানে। সেখানে ছোট গ্রাম মেসাজিনে গিয়ে সর্দার সারগাম সুলতানকে খুঁজে বের করতে হবে। একবার তাঁকে খুঁজে বের করতে পারলে আর কোনো ভাবনা নেই। সুলতানই পথ দেখিয়ে পার করে দেবে মাস্কিকে।

এরপর এক সন্ধেবেলা অনির্দিষ্ট যাত্রা শুরু হল মাস্কির। অন্ধকারে পথ চিনে চিনে গাড়ি চলল। কয়েক সপ্তাহ ধরে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা পথে অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষজন, ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে পৌঁছান গেল প্রান্তসীমার সেই গ্রামটায়। আর সেই গ্রামেই রোমাঞ্চকর একটা ঘটনা ঘটল মাস্কির ভাগ্যে। গ্রামের সর্দারের ছোটখাটো গোলগাল চেহারার উপপত্নীর সঙ্গে কয়েক রাত্রি সহবাস করতে হল মাস্কিকে। রমণীটি খুব অল্প সময়ের জন্য মাস্কির শরীরে আগুণ ধরিয়ে দিল, রক্তে তুফাণ তুলল। কয়েকটা দিন ঐ রমণীটি যেন মাস্কিকে গ্রাস করে রইল। তার উদ্দাম জ্বলন্ত শরীর দিয়ে ভরিয়ে রাখল পলাতক প্রাণটাকে।

দিনকয়েকের বিশ্রামের পর আবার নতুন যাত্রা শুরু করবার মুখেই অপ্রত্যাশিত এক বাধা এসে উপস্থিত হল। দুর্ধর্ষ এক ভ্রাম্যমান দলের দলপতি সাহিব খানের তাঁবুতে দিন কয়েক প্রায় বন্দীর জীবন কাটাতে হল তাঁদের। তারপর মাস্কির দুর্মূল্য ক্ষার কোটটার বিনিময়ে ছাড়া পেলেন তাঁরা। আর পাহাড় পর্বত বনভূমি ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত

তাঁরা একদিন এসে পৌঁছুলেন ছোট পার্শিয়ান শহর আসেরে। সেখানে এক নতুন সঙ্গী জুটল মাস্কির। এক সুবেশ তরুণ শিকারী—গুলাম হোসেন আগা। বড় অল্প সময়ের মধ্যেই গুলাম হোসেন মাস্কির এক গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠল। সারাদিন ছায়ার মত লেগে থাকে সে তাঁর সঙ্গে। বিদায়ের মুহূর্তে শিশুর মত কেঁদে ফেলল গুলাম। মাস্কিরও চোখের দৃষ্টি সজল হয়ে উঠল। কিন্তু কোনো উপায় নেই। যাত্রা সুরু করতে হল মাস্কিকে। আর ছয় দিনের পথ হেঁটে তাব্রিজে পৌঁছানোর পর এই প্রথম শহরে পৌঁছিয়েই মাস্কি আমেরিকান কনসাল অফিসে অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ধুলো নোংরা ভরা রাস্তা দিয়ে অনেকদূর হাঁটবার পর শহরের বাইরে অফিসটা পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ অফিসে অপেক্ষা করবাব পরই মাস্কিকে একটা সুন্দর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আর সেই ঘরে পা দেওয়া মাত্রই দীর্ঘ দিন পর মাস্কি বিস্মৃত প্রায় তাঁর দেশী জার্মান ভাষা শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠতে হল তাঁকে। চারপাশ ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে তাকিয়ে নিযে মাস্কি ঘরের মধ্যে একজন হাস্যোজ্জ্বল ভদ্রমহিলাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। তবে কী? উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠল তাঁর শরীব।

'ভয় নেই আপনার। আমি পলাতক জার্মান কন্‌সালের স্ত্রী। রাশিয়ানরা এ শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীকে পালিয়ে যেতে হয়। আমি আমেরিকান কন্‌সালের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছি।'

জার্মান ভাষায় সেই হাসিখুশি ভদ্রমহিলাটি কথা বলে গেলেন। আর এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মাস্কি। তারপর এক এক করে তিনি তাঁর পলায়নের সমস্ত কাহিনীটাই গড়গড় করে ভদ্রমহিলাকে বলে গেলেন। অনেকদিন পর সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পেরে মনটা হাল্কা হল তাঁর। ভদ্রমহিলার সঙ্গে অনেক কথা হল তারপর মাস্কির। দুই একটা হাসি ঠাট্টার কথাও হল। চা খাবার

খাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বিষণ্ণ মুখে তাঁর নিজের দুর্দশার কাহিনীটাও বললেন।

'কবে যে মুক্তি পাবো এই দুর্দশার হাত থেকে! বন্দীর মত আত্মগোপন করে জীবন কাটাচ্ছি। রাশিয়ানরা এই অঞ্চলের সমস্ত জয়গা প্রায় অধিকার করে নিয়েছে। আমার স্বামী যে কী অবস্থায় আছেন কিছুই জানি না। তবে আপনাকে বলি, যে করে পারেন, তাড়াতাড়ি এ শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। কারণ যে কোনো মুহূর্তেই আপনার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

কথা শেষ করে ভদ্রমহিলা একটা সুদৃশ্য ঝোলা বাড়িয়ে ধরলেন মাস্কিব সামনে। 'অল্প কিছু টাকাকড়ি আছে। পথে আপনার দরকার হবে।'

ভদ্রমহিলার সহৃদয়তায় চোখ ফেটে জল এল মাস্কির। প্রাণভরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি কেবল মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে ভদ্রমহিলার দুহাত চুম্বন করলেন আবেগভরে।

তারপর সারাদিন ধরে ভদ্রমহিলার টাকায় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা-কাটা করলেন, আর সন্ধ্যে নাগাদ চার ঘোড়ার গাড়িতে শহর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা সুরু করলেন মাস্কি। ঠাণ্ডা নরম হাওয়া ও দুধ-সাদা চাঁদের আলোয় চার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে অজানা পথের উপর দিয়ে চলতে অদ্ভুত লাগছিল তাঁর। আস্তে আস্তে সরল রাস্তা বাঁক নিয়ে পাহাড়ের পথ ধরল। আরামে ঘুমে চোখের পাতা দুটো জুড়ে এলো, একসময়ে গাড়ীর সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। একনাগাড়ে দিন তিনেক চলবার পর ঘোড়ার গাড়িটাকে বিদায় দিতে হল।

এরপর শুরু হল, পায়ে হাঁটা পথ পরিক্রমা। আরো দিন তিনেক চলবার পর সন্ধ্যে নাগাদ এক গ্রামে এসে পৌঁছুলেন মাস্কি। সে রাত্রিটা গ্রামের পোষ্টঅফিসের বারান্দায় কাটিয়ে দেবার পর হঠাৎ কাক ভোরে লোকজনের চীৎকারে ঘুম ভাঙল মাস্কির। আধো

তন্দ্রায় মানুষজনের চীৎকারের অর্থটা প্রথমে বুঝতে পারলেন না ভালো করে। পরে আস্তে আস্তে ঘুমের ভাবটা কেটে গিয়ে চোখের দৃষ্টিটা যখন স্পষ্ট হল, দেখতে পেলেন, একদল রুশ সৈন্য তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। চমকে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই কয়েকজন সৈনিক এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজন দুপাশ থেকে তাঁকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখে অন্য কয়েকজন তার পকেট হাতড়াতে লাগল।

তারপর ঘণ্টা খানেক ধরে তার চারপাশে কী কী ঘটনা ঘটল কিছুই আর খেয়াল রইল না মাস্কির। শুধু কেবল অবসাদে শরীরটা ভারি ভারি লাগতে লাগল তার। মাথার ভেতর সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল খোলা চোখের দৃষ্টি দিয়ে চারপাশ তাকিয়েও যেন তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। শুধু দুর্বোধ্য কতগুলো উত্তেজিত মানুষের গলার স্বর শুনতে পেলেন কানের কাছে। কে যেন একবার চীৎকার করে উঠল 'স্পাই' বলে। একটা ভারি লোহার রড এসে পড়ল পিঠের শিরদাঁড়ার উপর। সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে টলে উঠে, মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারালেন মেজর এ. ডি. ফ্রেন্‌জ মাস্কি

কয়েকটা সপ্তাহ এরপর মাস্কিকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলল। বিচার হল। অসহ্য কয়েকটা দিন কাটল তার উৎকণ্ঠায় আর শেষ পর্যন্ত আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সাইবেরিয়ার সেই বন্দী শিবিরে।

এরপর ১৯১৭ সালে আবার দ্বিতীয়বারে পলায়নের চেষ্টায় উত্তর ভ্লাডিভোস্টকের বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে সাইবেরিয়া এবং বিপদসঙ্কুল লাল রাশিয়ার ভয়ংকর পথ পরিক্রমা করে স্বদেশ ভূমিতে পৌছুতে পেরেছিলেন মেজর মাস্কি।



# লুপ্ত ঐশ্বর্যের সন্ধানে

যাত্রার ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে যাবার পর পানীয় জলের বিষয়টিকে বিশেষ করে জোর দিতে হল তাঁদের। জাভা এবং সুমাত্রার মধ্যবর্তী অংশটায় জলের কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু তারপরেই তো সেই চার হাজার মাইলের অকূল সমুদ্র। আর ওদিকটায় জাহাজে বা স্টিমারের তেমন যাতায়াত নেই। অতএব প্রথম থেকেই পানীয় জলের বিষয়টিতে নজর দিতে হল। অন্তত মাস তিনেকের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে তবে যাত্রা শুরু করতে হবে। মাস তিনেকের রসদে কুলিয়েও যেতে পারে, যদি ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়, অর্থাৎ ক্রোনেটস্ দ্বীপ খুঁজে পাওয়া গেলে পর যদি সেই দ্বীপে সহজে পদার্পণ করা যায়, তবেই জলের ব্যাপারটা আর ভাবতে হবে না। নচেৎ তেষ্টায় গলা বুক ফেটে গেলেও এক ফোঁটা জল পাওয়া যাবে না কোথাও। আর যে উদ্দেশ্যে এই কষ্ট স্বীকার করা, সেই সোনার টাকার বাক্স সমেত ডুবে-যাওয়া

জাহাজটিকে খুঁজে বের করতে যে কত দিন লাগবে, তাই বা কে জানে ?

তবুও "কালো মুক্তো" নামধারী ছোট্ট লঞ্চটা যেদিন ছাড়ল, সিনবাদ কিংবা সিংগাপুরের "লাল" স্যানডার্সের মনে অন্য কোনো উদ্বেগ ছিল না। বরং অজানা দ্বীপে রোমাঞ্চকর যাত্রার উত্তেজনায় তাঁদের শরীর মন উদ্বেল হয়েছিল। প্রথমে অ্যানজার পরে কিলিং-এ জলের ট্যাংকে জল ভরে নেওয়া হল। স্যানডার্স বললেন, "এ ছাড়া, যতখানি পারি বৃষ্টির জলও ভরে নেবো ট্যাংকে।" কেবলমাত্র পানীয় জলের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা ঠিকমত সহ্য হচ্ছিল না তাঁর। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল।

কেপ অফ গুড হোপের দক্ষিণে পৌঁছবার পর প্রথম দেখা পাওয়া গেল সেই বিশাল সমুদ্রের আর সেই ভয়ংকর ঝোড়ো হাওয়ার। সিনবাদের প্রথম ভয় হয়েছিল—এত হাওয়ার ধাক্কায় "কালো মুক্তো' নিশ্চিত উল্টে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, কাজের সময় দেখা গেল, ঝোড়ো হাওয়া কেটে বেশ তরতর করে চলেছে 'কালো মুক্তো'। বিশাল সমুদ্রের বুকে নির্ভীকভাবে চলেছে সে উত্তেজনাহীন।

স্যানডার্স লক্ষ রেখেছিলেন, সমুদ্রের বুকে অন্য কোনো জাহাজ দেখা যায় কি না—অন্তত দু-একটা প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যেতে পারে তাদের কাছ থেকে। সিনবাদ "কালো মুক্তো"কে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছিলেন। কিন্তু দিন চল্লিশেক সেই অকূল সমুদ্রের বুকে কেটে যাবার পরও যখন কোনো জাহাজের চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন হতাশ হলেন স্যানডার্স। আর ঠিক যেন সেই হতাশার মুহূর্তেই গাঢ় ঘন কুয়াশা নেমে এল আকাশ থেকে। আতঙ্কে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল সিনবাদের। এই কুয়াশায় না দেখা যাবে পথ, না যাবে এগুনো। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কাও আছে। বিশেষত, এই ঘন কুয়াশার পথ কেটে এগুনোর মত ভালো যন্ত্রপাতির একান্ত

অভাব তাঁদের। সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত একটা জাহাজী ঘড়িও নেই "কালো মুক্তোয়," যা আছে, তা হল একটা রান্না ঘরের কানেক্টিকটি পুরোনো ঘড়ি। যদিও সমুদ্রযাত্রার আগে ক্রোনেটস্ দ্বীপের ভয়ঙ্কর কুয়াশার কথা শুনেছিলেন তাঁরা, কিন্তু যাত্রা করবার সময় সে বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেন নি। বরং বিষয়টা সম্বন্ধে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন তাঁরা। আর সত্যি সত্যি যখন ঘন গাঢ় কুয়াশা দেখা দিল, তখন সব কিছু মনে পড়ল সিনবাদের। এমন অবস্থায় অনুশোচনা করেও কোনো লাভ নেই। অগত্যা সিনবাদ চোখের দৃষ্টিটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তাকাতে লাগলেন চারিপাশে। ভালো করে দেখা গেল না কিছু প্রথমে। পরে ঘন পুরু কুয়াশার সাদা পর্দাটা ভেদ করে দৃষ্টি চালিয়ে একটু একটু করে পথ চিনে এগুতে হল ভয়ে ভয়ে।

যতদূর পর্যন্ত খবর সংগ্রহ করা গিয়েছিল সেই নিমজ্জিত জাহাজের, তাতে করে এই কুয়াশার রাজ্য ছাড়িয়ে কিছু দূর গেলেই পাওয়া যাবে সেই স্থানটা। যদিও কোনো চিহ্ন নেই সেখানে— নিজেদের খুঁজে বের করে নিতে হবে। এছাড়া জাহাজের সেই জীবিত হতভাগ্য নাবিক তিনজনের বক্তব্য থেকে পাওয়া গিয়েছিল ক্রোনেটস্ দ্বীপের সেই মর্মান্তিক জীবনযাত্রার বিবরণ। সাত মাস পরে নর্থ ইস্ট দ্বীপে নির্জনে কোনোরকমে জীবন কাটিয়ে তারা বেঁচে ফিরেছিল সভ্যসমাজে। এতোতেও কিন্তু দমেন নি তাঁরা, সাহসের সঙ্গে 'কালোমুক্তো' চালিয়ে পার হয়েছিলেন এতটা পথ, কিন্তু এই কুয়াশাই তাঁদের ভীষণ ভয় দেখাল, বুক থেকে কেড়ে নিল সাহস।

যদিও নিমজ্জিত জাহাজ, তার সোনার মুদ্রা বোঝাই বাক্স ও নাবিকদের বিবরণ সমস্ত কিছুই ভয়াবহ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ অনুসন্ধান। যে-কাহিনী ভাবতে গেলেও সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষের শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান চালানোর কথা তো কিছুতে ভাবাই যায় না। সেই প্রায় দুঃসাধ্য কাজে যখন স্যানডার্স

আর সিনবাদ পা বাড়িয়েছিলেন, তখনই পরিচিত লোকেরা বলাবলি শুরু করেছিল তাঁদের সম্বন্ধে: একেবারে বদ্ধ উন্মাদ মানুষ দুটো তা না হলে ও-কাজে কেউ সাধ করে এগোয়। হয়ত কথাটা একেবারে ভুল নয়, নির্জন অকূল সমুদ্রে দীর্ঘদিন বসবাসের পর কখনও কখনও মনে হয়েছে সিনবাদের। বিফলতাই স্বাভাবিক, তাঁদের সফল হবার কথা ভাবাই যায় না। আর পদে পদে মৃত্যুর আশংকা। তবুও।

তিন দিন ধরে ঐ ঘন গাঢ় কুয়াশা ঘিরে রইল তাঁদের, আর চতুর্থ দিন একটু-একটু করে ফিকে হতে শুরু হল। এই তিন দিন ধরে নিষ্কর্মা হয়ে বসে না থেকে স্যানডার্স তার প্রাচীন ডুবুরির পোশাকটা ঠিকঠাক করল, পাম্পে নতুন ওয়াশার ঢোকাল, সারাল ফাটা-ফুটোগুলো আর সিনবাদ ব্যস্ত হয়ে রইল "কালো মুক্তোর" মালপত্তর গোছগাছ করবার কাজে।

তারপব কুয়াশা যখন কাটল, অস্পষ্টভাবে দূরে দেখা গেল একটা দ্বীপ, শোনা গেল পেঙ্গুইন পাখির চিৎকার আর কুয়াশা কাটার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র শীত নামল। ঠাণ্ডায় শবীরের রক্তবিন্দু জমে গিয়ে বরফ হওয়াব দাখিল, হাত পা অসাড়। আর সময় বুঝেই লুকনো থলি থেকে স্যানডার্স বের করে আনল একটা মদের বোতল। সিনবাদেব জীবনে মদ্যপানের অভিজ্ঞতা এই প্রথম, বোতলের ঐ তরল পানীয়টা গলা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল তাঁর আর সঙ্গে সঙ্গেই উষ্ণ হয়ে উঠল শবীর, স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস পড়ল।

যদিও দ্বীপটিকে প্রথম দর্শনে বড় কাছাকাছি মনে হয়েছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দিন চাবেক লাগল। কারণ কুয়াশা কেটে যাবার পর শীত নামবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঘূর্ণী শুরু হয়েছিল সমুদ্রের বুকে। সাঁই সাঁই বাতাসের ধাক্কা এড়িয়ে "কালো মুক্তো"কে দ্বীপের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল তাঁদের পক্ষে।

দিন চারেক কাটবার পর বাতাসের বেগ এল শান্ত হয়ে আর খুব

সহজেই "কালো মুক্তো"কে চালিয়ে নিয়ে দ্বীপে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। তারপর নোঙর ফেলে গুছিয়ে বসতে সেই গেল একটা দিন। সেই রাত্রে বড় শান্তিতে ঘুমুলেন তাঁরা। আর পরদিন ভোরবেলায় সূর্য উঠবার আগেই এক কাপ গরম কালো কফি পান করে ডুবুরির পোশাক পরে জলের তলায় নেমে গেলেন স্যানডার্স, সিনবাদ দড়িদড়া ধরে 'কালোমুক্তো'র পাটাতনে বসে চারিদিক লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। এমন জায়গায় সবসময় প্রস্তুত হয়ে থাকার বড় প্রয়োজন, কারণ, বলা যায় না কখন কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে, আসবে কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদ। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন সিনবাদ। হঠাৎ জলের তলায় নেমে যাওয়া বাতাসের নলটি কেমন ছট্‌ফট্ করে নড়ে উঠল, জলের তলা থেকে সংকেত জানানোর দড়িটা বার বার কেঁপে উঠতে লাগল, কয়েক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন সিনবাদ। আর দেরি করলেন না, প্রাণপণে স্যানডার্সের কোমরে জড়ানো দড়িটা ধরে টানতে লাগলেন। শরীরের সমস্ত শক্তি হাতের পেশীতে গুটিয়ে এনে প্রাণপণে টানতে টানতে নাক দিয়ে কয়েক ফোঁটা গরম রক্তও গড়িয়ে নামল সিনবাদের গালে। কিন্তু তবুও তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন না, ববং মরিয়া হয়ে টানতে লাগলেন দড়ি। আর আস্তে আস্তে একটু একটু করে জলের তলা থেকে উঠে আসতে লাগলেন স্যানডার্স। অবশেষে কোনোরকমে পাটাতনের উপর এসে উঠলেন তিনি। তারপর বহু কষ্টে ডুবুরির পোশাক থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পাটাতনের উপব একটা ভারা বোঝার মত গড়িয়ে পড়লেন। সিনবাদ দেখলেন কেমন ফ্যাকাশে আর আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তার মুখ চোখের চেহারা।

'কী হয়েছে কী,' বন্ধুর মুখের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন সিনবাদ।

'আর বল কেন। বাতাস ঢোকবার পাইপটা ফুটো হয়ে গেছে

আর তা দিয়ে ঢুকেছে জল, দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়,' কোনোরকমে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ক্যাকাশে মুখে বললেন স্যানডার্স।

'কিছু দেখতে পেলে তলায়।' সিনবাদের ব্যগ্র প্রশ্নে ভ্রূকুটি করে মুখ ফেরালেন স্যানডার্স। তারপর চাপা বিরক্তির গলায় বললেন :

'হ্যাঁ অনন্ত পাতাল দেখলাম। বলছি না প্রাণসংশয় অবস্থা আমার তখন, লুপ্ত ধন খুঁজবো না নিজের প্রাণ বাঁচাবো।'

স্যানডার্সের উষ্ণতায় শারীরিক কষ্টের মধ্যেও হেসে উঠলেন সিনবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে কানে এল তাঁর বাতাসের গুড় গুড় ধ্বনি। আর পশ্চিমের দিকে এক পলক তাকিয়েই চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

'স্যানডার্স, জলদি নোঙর তুলে নাও।'

সিনবাদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটি বাতাসের ঝাপটা লাগল পাটাতনের উপর, ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্যানডার্সের গায়ে, আর সেই ধাক্কায় সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সিনবাদ ততক্ষণে একটা নোঙর তুলে ফেলেছেন কোনোরকমে, অন্যটার দিকে হাত বাড়িয়েছেন দ্বিতীয় নোঙরটি তুলে ফেলবার আগেই জলের ঢেউ ও বাতাসের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল 'কালো মুক্তো'। সিনবাদ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন পাটাতনের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে 'কালোমুক্তো'র কাঠের থামটা দুহাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন। মুহূর্তের জন্য বেঁচে গেলেন তিনি। স্যানডার্স ততক্ষণে 'কালো মুক্তো'র কেবিনে ঢুকে ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছেন। জলের উপর ভয়ঙ্কর একটা লাফ দিয়ে উঠে মুখ গুঁজে 'কালো মুক্তো' ছুটতে শুরু করে দিলো।

মাইলখানেক একটানা ছোটবার পর আবার নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্র পাওয়া গেল ততক্ষণে ঘূর্ণিঝড়ও থেমে গেছে। শান্ত সমাহিত ভঙ্গি ফিরে আসছে উত্তাল জলরাশির।

'ঈশ্বরের দয়ায় একটুর জন্য বেঁচে গেছি আমরা।' কোনোরকমে

প্রথম সুস্থভাবে কথা বললেন সিনবাদ অনেক্ষণ পরে। তাঁর কথার কোনো জবাব না দিয়ে শরিরীক অবসাদে নিঝুম হয়ে বসে রইলেন স্যানডার্স। ক্রমশ আশাটা কমে আসছে, মনে ভয় ঢুকছে।

সেই রাত্রিটা শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ভেসে থাকার পর ভোর নাগাদ আবার পূর্বদিকে 'কালো মুক্তো'কে ভাসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুটা দূরে যাবার পর আচমকা আবার একটি ঘূর্ণীঝড় উঠল সমুদ্রে। এত অতর্কীতে ঘটনাটা ঘটল যে সাবধান হবার কোনো সুযোগ পেলেন না সিনবাদ। আচমকা ধাক্কায় আছড়ে পড়লেন ডেকের উপর আর সেই প্রচণ্ড ধাক্কার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি।

পরদিন দুপুর নাগাদ যখন জ্ঞান ফিরল সিনবাদের, চোখের ঘোর কেটে যখন দৃষ্টিটা একটু স্বচ্ছ হল তাঁর, চারিপাশে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। সমুদ্র তীরের বালুবেলায় শুয়ে আছেন তিনি, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আর বিষণ্ণমুখে পাশে বসে আছেন স্যানডার্স। চারিপাশে তাকিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না পেরে সিনবাদ প্রায় চীৎকার করে উঠলেন : 'এ আমরা কোথায়?'

'বোধ হয় সেন্ট পল দ্বীপে।' মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় উত্তর দিলেন স্যানডার্স। 'আমাদের সর্বনাস হয়েছে। পরে সব বলব তোমায়, এখন একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।' কেমন ছাড়া ছাড়া এলোমেলো ভাবে কথা বলে গেলেন স্যানডার্স আর তাঁর কাঁধের দুপাশে ধরে সিনবাদকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন।

কোনোরকমে স্যানডার্সের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে সিনবাদের চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল, পায়ের নিচের মাটিটা যেন সরে গেল। কোনোরকমে বন্ধুকে ধরে নিজের শরীরের পতনটি সামলালেন তিনি।

'কেমন লাগছে এখন?' একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকেও কোমল গলায় কথা বললেন স্যানডাস।

'ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে।' দুর্বল গলায় কোনোরকমে উত্তর দিলেন সিনবাদ।

আর খানিকটা সুস্থ হবার পর নিজেদের ভয়ঙ্কর অবস্থাটা অনুভব করে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। সমুদ্র উপকূলে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে 'কালো মুক্তো।' সমুদ্রের ঢেউ-এ ভেসে গেছে তার কিছু অংশ, জলের ঢেউ-এ ভেসে গেছে মালপত্তর দড়ি দড়া।

'কী, অমন উজবুকের মত বসে আছ কেন? এসো হাত লাগাও, যা কিছু বাঁচানো যায় তাই কাজে লাগবে আমাদের। আর শুধু শুধু চিন্তা ভাবনা করে কী লাভ হবে।' বন্ধুর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন স্যানডার্স আর বালুকাবেলা থেকে ছিন্ন পাল, দড়াদড়ি, বালতি, ভাঙা কাঠের টুকরো, পেরেক সংগ্রহ করতে লেগে গেলন তিনি। সমুদ্র উপকূলে স্তব্ধ হয়ে বসে সব দেখে গেলেন সিনবাদ।

তারপর পুরো একটা দিন লাগল তাঁদের দ্বীপটার বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞান সঞ্চয় করতে মাইল তিনেক চওড়া দ্বীপটি। মাঝখানে একটি লেকের মত আছে ন আছে ঘন ঝোপ না গাছপালা। দ্বীপটাকে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির একটা অংশ বলেই মনে হল তাদের 'কেবল ছেঁড়া ছেঁড়া ঘাস, তার মধ্যে ইঁদুর, খরগোশ আর বুনো ছাগলের দল। স্যানডার্স একটা খরগোশ ধরার চেষ্টা করে প্রথমদিন বিফল হলেন। ঐ নধর প্রাণীটি বিদ্যুৎ-এর গতিতে ঘাসের জঙ্গল নাড়িয়ে ছুটল, কিছুতেই তাকে ধরতে পারলেন না স্যানডার্স জলাশয় পরীক্ষা করে দেখা হল। সব সময় টগবগ করে ফুটছে গরম জল, মাঝে মাঝে আবার মাটির স্তূপ মাথা তুলে আছে। দ্বীপের পশ্চিম দিকে হঠাৎ তারা একটি পাথরের তৈরী ঘর আবিষ্কার করে বিস্মিত হলেন। ভাঙা দরজার একটা পাল্লায় খোদাই করা আছে কিছু ফরাসী শব্দ। স্যানডার্স লেখাটা পড়ে দেখলেন। ঠিক একটা বিজ্ঞপ্তির ভঙ্গীতে লেখা: এই পাথরের ঘরটি জাহাজ ডুবিতে আক্রান্ত নাবিকদের জন্য নির্মিত, ঘরের ভেতর যে খাদ্য ও বস্ত্র সকল মজুত আছে তা তাদের ব্যবহার করবার জন্য রাখা হয়েছে।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল উল্টানো জালা, টিনের খালি কৌটো, ছেঁড়া-খোড়া কাপড়ের টুকরো আর ঘর ভর্তি বালি ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

'হায়রে হতভাগা!' ঘরের অবস্থাটা দেখে ঠাট্টার গলায় চিৎকার করে উঠলেন স্যানডার্স।

খুঁজতে খুঁজতে আরো দুই একটা জিনিষ চোখে পড়ল তাঁদের। একটা লম্বা মাস্তুলের কাঠি পোঁতা আছে সমুদ্রের ধারের এক নিরাপদ অংশে: একটা ফেঁসে যাওয়া তাঁবু, দুটো কাঠের ভাঙাচোরা চেয়ার, জংধরা একটা লম্বা ছোরা আর পুরু কাগজে বাঁধাই এক বোঝা উলঙ্গ মেয়ের ফটো। উত্তেজক মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দী সব হাস্যোজ্জ্বল নধর চেহারার রমণীদের নগ্নচিত্র। বেশ বোঝা যায় পোড় খাওয়া নাবিক-কূলের উত্তেজক যৌন উপাদান। ছবিগুলো হাতে নিয়ে এই ভয়ংকর সর্বনাসের মধ্যেও হাসি পেল সিনবাদের। একবার দার্শনিকের মত মনে হল---হায়রে মানুষের জীবন আর তার শরীর।

দ্বিতীয় রাত্রিটা ঐ পাথরের ঘরটায় কাটল তাঁদের। বাধ্য হয়ে লেকের গরম জল পান করে বিস্বাদ লাগল না। একদল বুনো বেড়ালের দেখা পাওয়া গেল পুকুর পাড়ে। দ্বীপে বাস করার দ্বিতীয় দিনে পেঙুইন পাখীর মাংস দিয়েই ভোজ সারতে হল তাঁদের। এর মধ্যে বুদ্ধি করে স্যানড়ার্স তাঁর একটা লালটুকটুকে জামা বেঁধে দিয়ে এলেন সমুদ্রের ধারে পোঁতা উঁচু মাস্তুলটার উপর।

তৃতীয় দিন নিজেদের জিনিষপত্র হিসাব করেই কাটল। কাঠ কাটবার কুড়ুল, সূতো, ক্যানভাস ইত্যাদি ছাড়া প্রয়োজনীয় অন্য সব জিনিস পাওয়া গেল। স্যানডার্স ঘাস দিয়ে খরগোশ ধরার একটা জাল তৈরী করে ফেললেন চটপট। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল ঘাসের তৈরী জাল দাঁতে কেটে পালিয়ে যাচ্ছে খরগোশগুলো। সারা-দিনে জাল পেতে একটাকেও ধরতে পারলেন না তাঁরা। অগত্যা সন্ধ্যে নাগাদ সিনবাদকে পাথর ছুঁড়ে খরগোশ মারার কাজে নামতে হল।

যদিও ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির অংশ বলে সারা দিনমান মাটিটা গরম থাকে দ্বীপের, কিন্তু সন্ধ্যে হলে ঝিরঝিরে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে। স্যানডার্সের থলি ভর্তি ম্যাচবাক্স থাকায় ভাঙা জাহাজের কাটকুটো দিয়ে প্রথম কয়েকদিন রাত্রে আগুন জ্বালানো হল। পরে শুকনো ঘাসের বোঝা দিয়েও আগুন জিইয়ে রাখা হল কয়েকটি দিন। কিন্তু ক্রমশ ম্যাচবাক্স খালি হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া আগুন আর জ্বালতেন না তাঁরা। সব বিষয়ে সতর্ক চোখ রেখে মিতব্যয়ী হতে হল তাঁদের।

একদিন তো অনেক কৌশল করে একটা বুড়ো ছাগল ধরা হল। তার ছাল চামড়া হাড় দিয়ে পায়ের জুতো, মাথার টুপি, মাছ ধরার বঁড়শি তৈরি করা হল। মাংসটা রাখা হল জমিয়ে। যদিও ইঁদুর আর বেড়াল চুরি করে খেয়ে গেল তার বেশীর ভাগ অংশ।

দিন যেতে লাগল নির্বাসনে। দেখতে দেখতে কেটে গেল এগারটি সপ্তাহ। ক্রমশ হতাশ হতে হতে আশাহারা হয়ে উঠলেন তাঁরা। সমস্ত কাজকর্মের মূল্য হারাল তাদের চোখে। যদিও স্যানডার্স প্রাণপণে দ্বীপ ভরে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন একটা নৌকো তৈরী করার উপযুক্ত কাঠকুটো, সমুদ্রের উপকূলে বালির মধ্যে খুঁড়ে খুঁড়ে মাঝে মাঝে দু-একটা ভাঙা নৌকার পচা কাঠের খণ্ড খুঁজে পাওয়া যেতে লাগল—কিন্তু স্যানডার্স তাতেও নিরাশ হলেন না। বরং দিনের পর দিন সমান উৎসাহে তিনি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন সমুদ্রের বেলাভূমি, বালির ঢিবি আর ঘাসের ঝোপ তন্ন তন্ন করে। আর সেইকাজে একদিন ভোরবেলায় বালি খুঁড়তে খুঁড়তে লোহার খুন্তিতে একটা শক্ত মতন কিছুর ধাক্কা লাগল। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে থেকে তারপর পূর্ণ উদ্যমে স্যানডার্স খুঁড়তে লাগলেন বালি। সিনবাদও এসে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। তারপর দুপুর নাগাদ বালি খুঁড়ে খুঁড়ে যখন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন বিশাল গর্তের ভেতর থেকে স্যানডার্স ভারী একটা বোঝার মত কী যেন তুলে আনলেন।

'কী, ওটা কী?'

'একটি বাক্স।'

'যেন ক্যাশবাক্সের মত মনে হচ্ছে।' কথা বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠউ সিনবাদের।

'আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।' গম্ভীর শান্ত গলায় বাক্সের উপর থেকে ধুলো বালি মুক্তো করতে করতে উত্তর দিলেন স্যানডার্স। 'আগে খোলা যাক।'

দিনটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এল। তাড়াতাড়ি শুকনো ঘাসেব বোঝা এনে আগুন জ্বালালেন সিনবাদ। উত্তেজনায় শরীর জ্বলছে তাঁদের, চোখেব দৃষ্টিটা কলঙ্কমুক্ত বাক্সটার উপর স্থির হয়ে আছে। শরীরের সমস্ত শক্তি হাতের পেশীতে সংহত করে ছুরির ফলাটি দিয়ে প্রাণপণে বাক্সটি খুলবার চেস্টা করছেন স্যানডার্স। এক সময় অদ্ভুত একটা শব্দ করে বাক্সের বন্ধ ডালাটা লাফিয়ে উঠে খুলে গেল। তাঁরা দুজন হুড়মুড় করে ঝুঁকে পড়লেন ডালাখোলা বাক্সটার উপর আর আগুনের কুণ্ডর উজ্জ্বল আলোয় তাঁবা স্পষ্টই দেখতে পেলেন কালচে রঙের সোনার মুদ্রায় বাক্সটা ভর্তি। কয়েক মুহূর্ত তাঁদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। তারপর হঠাৎ এক সময় দারুণ একটা চীৎকার করে মাটির উপর ডিগবাজি খেলেন স্যানডার্স, সিনবাদ ঘাসের জ্বলন্ত স্তূপটার উপর আনন্দে একটা লাথি ছুঁড়লেন। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে তাঁরা যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য ভুলে গেলেন তাঁদের ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের কথাটি, ভুলে গেলেন নির্বাসিত জীবনের কথা।

সারা রাত্রি ধরে তারপর তারা বাক্সের সোনার মুদ্রাগুলো গুনে শেষ করলেন। দু হাজার অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন দুর্মূল্য স্বর্ণমুদ্রা। গুনতে গুনতে তাঁদের হাত ব্যথা করে উঠল, চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপতে লাগল। আর গোনা শেষ করে তাঁরা অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মাটির উপর। বিপুল সম্পদ। সিনবাদের মনে হল কয়েকটা

বাষ্পচালিত সুন্দর ইয়াচ এবং কয়েক-শ' রেসের ঘোড়া, স্যানডার্সের মনে হল বিশাল একটা বাগানবাড়ি আর দামী দামী সুন্দর পোশাক পরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সাহচর্য।

তারপর দিন তিনেক ধরে স্বর্ণমুদ্রাগুলো সমান ভাগ করে দুটো জলের ব্যাগ ভরে একটা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন তাঁরা। দিনগুলো আবার পুরোনো চালে ফিরে গেল। আশা নেই, উত্তেজনা নেই, সেই একটানা কর্মচক্র আর থেকে থেকে সমুদ্র উপকূলে ছুটে গিয়ে জাহাজের আশায় দূর সমুদ্রের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকা। কিন্তু বারো সপ্তাহের মাঝামাঝি হঠাৎ বিন্দুর মত সমুদ্রের বুকে দেখা দিল একটা জাহাজ। একটা আশার আলো জ্বলে উঠল তাঁদের চোখে। দূর সমুদ্রে আস্তে আস্তে সেই বিন্দুটা পূর্ণ চেহারা নিতে লাগল দিনে দিনে। আর শেষ পর্যন্ত একদিন ভোরবেলায় 'অটোয়েন' জাহাজের একটা বোট এল দ্বীপে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অদ্ভুত দ্বীপটা থেকে মুক্তি পাওয়ার মুহূর্তে তাঁরা দুজনই শিশুর মত দ্বীপটার জন্য হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। তারপর একসময় নতজানু হয়ে দ্বীপের মাটি শেষবারের মত চুম্বন করে বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে বোটে গিয়ে উঠলেন তাঁরা। কয়েকটি সপ্তাহের সেই অদ্ভুত আবাসভূমিটি তাঁদের দুটি সন্ধানী আত্মার জন্য ক্ষণিক তপ্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল

# হায় প্রেম



একটা অশুভ ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি। সমস্ত জীবন দুঃখ, হতাশা আর বিফলতা ঘুরেছে তাঁর পায়ে পায়ে। নিজেব পিতামাতার নাম জানতে পারেন নি তিনি দীর্ঘকাল। অনেক আশ্রিত হয়ে জীবনের বেশীর ভাগ অংশ কেটেছে তাঁব। জন্মেব সময় পিতামাতার নাম হিসাবে যাঁদের নাম লেখা হয়েছিল সেই ১৭৩২ সালেব রেজিস্টারেব পৃষ্ঠায় তাঁরা কিন্তু কেউই কন্যাটির সত্যিকারেব জনক-জননী ছিলেন না, এমন কি সেই হতভাগ্য চাষী দম্পতিটি জীবিতও ছিলেন না কন্যাটির জন্মকালে। কেবল মাত্র একটি গোপন কলঙ্ক ঢাকা দেবার জন্যই সবকারী খাতায় ব্যবহার করা হয়েছিল তাঁদেব নাম। আসল সত্যটা জানা ছিল দুজন মাত্র বযস্কা ধাত্রীব, যদিও বিপুল অঙ্কেব অর্থ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছিল তাঁদের। যাঁরা তার জন্মেব প্রতি কটাক্ষ করে দীর্ঘকাল একটা নোংরা আলোচনা চালিয়ে গেছেন, তাঁরাও কিন্তু জানতে পারেন নি যে কন্যাটি অভিজাত সমাজের

চূড়ামণি কাউন্টেস ডি অ্যালবনের গর্ভজাত ও বিখ্যাত মারাকাস দি ভিচি চ্যমরগু তাঁর জনক।

সেই দুঃখী রূপসী জুলি ডি লেস্‌পিনেস্‌কে পালিত কন্যার মর্মান্তিক জীবন কাটাতে হয়েছে, কাউন্টেস ডি অ্যালবনের প্রাসাদে দীর্ঘকাল আর সে কী চরম দুঃস্থ দিনযাপন। কাউন্টেসের সেই হিংসুটে বদ ভাবের কন্যা ডানিয়া দি অ্যালবনের ব্যক্তিগত দাসীর মত থাকতে হয়েছে তাঁকে চিরকাল। ডানিয়ার অত্যাচার সইতে হয়েছে মুখ বুজে একদিনের জন্যও ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারেন নি তিনি শৈশবে বা কৈশোরে। সারা দিন ধরেই বিনা কারণে গালাগালি আর লাঞ্ছনা চলত তাঁর উপর দিয়ে। পরিশ্রমে কোমল শরীর ভেঙে পড়তো সহজেই। ফলে মাথাঘোর শুরু হত, সেদিনের মত রাত্রির খাবার বন্ধ হয়ে যেত তাঁর। একটা ঠাণ্ডা ঘরে একা তাঁকে আটকে রাখা হত ডানিয়ার আদেশ অনুযায়ী। আর সেই ঠাণ্ডা নির্জন ঘরে ক্ষুধায়, ভয়ে সারা রাত্তির ঘুম আসত না জুলির। অবিরল অসহায় কান্নায় বিছানা যেত ভিজে। ভোরবেলায় ডানিয়ার সামনে নতজানু হয়ে বসে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে তবে নিস্তার পেতেন তিনি। প্রতিদিন এমনি ধারায় তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো কাটত। এক ফোটা স্নেহ বা মমতার জন্য কাঙালপনার আর বুঝি শেষ ছিল না তার! সহজে ভাগ্যে কিছুই জুটত না বলে সকল কিছুর জন্য জুলির মনে জন্মেছিল এক তীব্র চাওয়া। আড়াল থেকে তিনি দেখতেন কাউন্টেস্‌ ডি অ্যালবন ও মারাকাস্‌ দি ভিচি চ্যমরগুকে। তাঁদের দেখে কী যেন মনে হত তাঁর। বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠত জুলির। ঐ মানুষ দুজনকে যেন তাঁর বড় আপনার মনে হত।

তারপর একদিন এক কেলেঙ্কারী ঘটল প্রাসাদে। জানা গেল কুমারী ডানিয়া গর্ভবতী হয়েছেন এবং তাঁর গোপন প্রেমিকটি হলেন চ্যমরগু স্বয়ং। অগত্যা সমাজের মুখ চাপা দেওয়ার জন্য ডানিয়ার সঙ্গে বিবাহ হল চ্যমরগুর। এরপর থেকে এক অদ্ভুত প্রায় অবিশ্বাস্য

প্রেম আবর্তিত হতে লাগল তিনটি চরিত্রকে ঘিরে। চামরণ্ড, ডানিয়া আর ডাচেস্ এই তিনজনে মিলে এক অসম্ভব উপাখ্যান রচনা করলেন।

আর হতভাগা জুলি বিয়ের পর ডানিয়ার সঙ্গে এসে উঠলেন চ্যমরণ্ডের প্রাসাদে নতুন প্রাসাদে জুলি পেলেন গভর্নেসের পদ, অল্প কিছু হাত খরচও পেতে লাগলেন তিনি। কিন্তু জীবনযাত্রার কোনো পরিবর্তন হল না তার। সেই একই ধরনের অত্যাচার আর পীড়নের অসহায় জীবন কাটাতে লাগলেন তিনি। নতুন প্রাসাদে এসেও একটুকু শান্তি বা সুখ পেলেন না বরং দুঃখের মাত্রাটা গেল বেড়ে। ডাচেসের প্রাসাদে তবুও জুলির শোবার ঘরটায় জানলা ছিল, আগুনের চুল্লী ছাড়াও ঘরটা গরম থাকত রাত্রি বেলায়। আলো-হাওয়া ছিল। কিন্তু চ্যমরণ্ডের প্রাসাদে তাঁর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল নিচের তলায় একটি অন্ধকার স্যাতসেঁতে ঘর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারার সব ইঁদুর ঘুরে বেড়াত সেই ঘরে। ঠাণ্ডায়, ইঁদুরের ভয়ে সারা রাত্তির ঘুম আসত না জুলির চোখে। আর ছিল অখাদ্য খাবার। পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও তাঁকে যতসব ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা জামা-কাপড় পরতে দেওয়া হত। যদি বা সাধারণ রাত্রিগুলো কোনো রকমে কাটত জুলির কিন্তু উৎসবের সন্ধ্যাগুলো যেন ভারী পাথরের মত চেপে বসত তাঁর বুকের উপর। আর চ্যমরণ্ডের প্রাসাদে উৎসব লেগে থাকত অহরহ। আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠত প্রাসাদ, দামী দামী পোশাক-পরা সুবেশ সব মানুষজন অলসভাবে ঘুরে বেড়াত প্রাসাদের ঘরে ঘরে মদের ফোয়ারা ছুটত. ভালো ভালো সব খাবারের গন্ধে ভরে থাকত বাতাস। কিন্তু জুলির হুকুম ছিল না সেখানে যাবার, এমনকি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হত সেই সব সন্ধ্যায়। যেন তিনি একটা অদ্ভুত কোনো জীব, সে যেন মানুষ নয়, তাঁর যেন কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মুখে-চোখে একটা দুঃখের ছাপ পড়তে শুরু করেছিল। আর তাই বুঝি সহজেই তিনি চামরণ্ডের এক বৃদ্ধা নিঃসন্তান আত্মীয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সেই আশ্চর্য বুদ্ধিমতী, মিষ্টি স্বভাবের মাদাম ডিউ ডেফাণ্ড জুলিকে তারপর একদিন তাঁর দুঃখ-কষ্টের জীবন থেকে মুক্ত করে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। চ্যরমণ্ড বা ডানিয়াও সহজে জুলিকে ভদ্রমহিলার সঙ্গে চলে যেতে দিলেন। কারণ জুলির রূপের বিষয়ে ডানিয়ার মনে ছিল গোপন একটা ঈর্ষা আর ঐ বেজন্মা বালিকার উপর চ্যমরণ্ডের ছিল এক অহেতুক উগ্মাব ভাব।

এতদিন বাদে জুলির জীবনে যেন শান্তি নেমে এল। ডেফাণ্ড-এর সেই ছোট নির্জন প্রাসাদে পা দিয়ে তিনি জীবনে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন। জীবনে এই প্রথম গলা খুলে হেসে উঠলেন জুলি। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদের সেই আলোকোজ্জ্বল সুন্দর ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন তিনি। আর ক্রমশ তাঁর মুখশ্রী থেকে দুঃখের কালো ছাপটা মুছে গেল, সেখানে এক অকৃত্রিম সুখ ও আনন্দের উজ্জ্বলতা এসে বাসা বাধল। নিজেকে এক রূপবতী তরুণী হিসাবে তান আবিষ্কার করলেন একদিন। দিনরাত্রিগুলিকে স্বপ্নময় বলে মনে হল তার। আস্তে আস্তে তিনি ফুটে উঠতে লাগলেন। কানায় কানায় ভরে উঠেছে জীবন, রূপে, রসে, স্নেহে, সাফল্যে, অথচ কোথায় যেন একটা ফাক রয়ে গেছে, রয়ে গেছে এক অতৃপ্ত অথচ এই নতুন জীবনে কী নেই তার, বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় রাজ দরবার থেকে পাওয়া গেছে একটা মোটামুটি উঁচু অংকের মাসোহারা, সুন্দর ছিমছাম একটি ছোটো প্রাসাদ, ফুলের বাগান আর সবচেয়ে প্রিয় লাল আর সোনার রঙে চিত্রিত আলোকোজ্জ্বল শয়ন কক্ষ; বাছা বাছা সঙ্গী-সাথী, সামাজিক আসরে সম্মানিত আসন। সুখ আর আনন্দের জীবন। এছাড়া আর কী বা চাওয়ার ছিল তার। এর থেকে আর কী বা বেশী পাওয়ার ছিল তাঁর। বরং যন্ত্রণাময় অতীতে তিনি যে জীবনের কথা ভেবে এসেছেন এতদিন, তার চেয়েও বেশী ভাগ্যে জুটেছে। তবু অহরহ একটা অতৃপ্তি জুলিকে পাগল করে তুলল। আর ঠিক সেই অবস্থায়ই জুলির সঙ্গে এক ভোজসভায় দেখা হল, এক কালো চোখের রূপবান

পুরুষ মারাকাস ডি মোরার চমকে উঠলেন জুলি। তাঁর বুকের ভেতর এক নতুন ধরনের আলোড়ন দেখা দিল। তবে কী এই সেই পুরুষ, যাকে পেলে জীবনে আর কোনো অতৃপ্তি থাকবে না তাঁর। তবে কী এর জন্যেই জীবনে অতৃপ্তি ছিল তাঁর। সব পেয়েও মনের ভেতর থেকে যাবে না কোনো ফাঁক।

মোরার সঙ্গে জুলির পরিচয় হতে দেরি হল না, বরং বড় দ্রুতই ঘনিষ্ঠতা জন্মাল তাদের, আর সেই ঘনিষ্ঠতা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রূপান্তরিত হল এক উন্মত্ত ভালোবাসায়। সেই তেইশ বছরের স্পেনীয় রাষ্ট্রদূতের সৈনিক পুত্র, ধনী ও অভিজাত বংশীয় সত্ত যুবক মোরা উন্মত্তের মত ভালোবেসে ফেললেন চৌত্রিশ বছরের জুলি ডি লেসপিনাসকে। জুলির আচার-আচরণে কিন্তু ভালোবাসার তেমন উন্মত্ত রূপ প্রকাশ পেলো না, বরং এক বয়স্ক রমণীর প্রেমের মত অত্যন্ত গোপন, সংযত ও চতুর অভিজ্ঞ দেখালো তার প্রেমের রূপটি। অথচ ভিতরে ভিতরে মোরার বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্য জুলি উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলেন, যদিও মোরার উন্মত্ত ভালোবাসার ব্যাপারে তাঁর একটি ভয়ও ছিল, কারণ তিনি তাঁর [illegible] মৃত্যুর কাহিনীটা শুনেছিলেন প্রথম সন্তানের জন্ম দেওবার সময় মোরার বাহুতে মাথা রেখে মারা গিয়েছিলেন তিনি। কাহিনীটা শোনবার পর থেকেই মোরার আচার-আচরণে তিনি যেন আশঙ্কাজনক কিছু একটা ব্যাপার খুঁজে পেয়েছিলেন, যেন বিধ্বংসী কোনো শক্তি দেখেছিলেন মোরার শরীরে। তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল জুলিকে। মোরাই একমাত্র পুরুষ যে তার মনে এই প্রথম প্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিল ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আতঙ্কটাও মন থেকে মুছে যাচ্ছিল না কিছুতে। আর সমস্ত প্যারিস ভরে তাঁদের ভালোবাসার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমশ। সামাজিক আসরে সেটা একটা উত্তপ্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। অথচ অদ্ভুত এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলছিল জুলির মন, কোনো কিছুই তিনি মনস্থির করতে পারছিলেন না।

এই অবস্থায় একদিন সন্ধ্যায় নির্জন প্রাসাদে জুলির পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসে মোরা বিবাহের প্রস্তাব করলেন। মোরার সুরেলা গম্ভীর গলার উচ্চারিত কথাগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন অবশ করে দিল জুলিকে। তাঁর চোখের কোণ বেয়ে নেমে এলো দীর্ঘ জলের ফোঁটা। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি। তারপর অনেক কষ্টে অস্ফুটে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করলেন জুলি, 'তুমি যদি আমাকে বিয়ে করে সুখী হবে ভেবে থাকো তবে আমারও কোনো আপত্তি নেই।'

ভালো করে জুলির কথাটা শেষ করতে দিলেন না মোরা। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন জুলির বুকে। তারপর উন্মত্তের মত চুম্বন করতে লাগলেন তাকে।

চুম্বনের তীব্রতায় জুলির নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। কোনোরকমে মোরার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাল টুকটুকে গালে হাত ঠেকিয়ে জুলি দি লেস্‌পিনেস।

কিন্তু তাঁদের বিবাহের ব্যাপারে বাধা এল চতুর্দিক থেকে। স্পেনের সবচেয়ে উঁচু বংশের তরুণের সঙ্গে কিনা বিয়ে হবে ঐ [illegible] বছরের বড়, বেজন্মা রমণীর? এ যেন ভাবাই যায় না। সামাজিক আসরে আসরে এই আলোচনাটা নিত্য নতুন রঙ ফলিয়ে পরিবেশিত হতে লাগল। সবাই ধিক্কার দিল জুলিকে, ছি-ছি করল। একজন অল্পবয়সী যুবকের মাথা [illegible] দেবার কোনো অধিকার নেই তার মত রমণীর। এই বিবাহের আলোচনাটা এমন কুৎসিত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, জুলি মাঝে মাঝে দু-একটা করে উড়ো চিঠি পেতে লাগলেন। প্রতি চিঠিতেই তাঁকে বার বার করে সাবধান করে দেওয়া হতে লাগল যে, বিয়েটা যেন না হয়। জুলি যেন মোরার প্রস্তাবে সম্মতি না দেয়। প্রথমে দিশেহারা হলেও জুলি মনটাকে শক্ত করলেন ক্রমশ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিবাহের ব্যাপারে মোরা তখন উন্মাদ। জুলিকে ছাড়া তাঁর একমুহূর্ত চলবে না।

অগত্যা স্পেনের রাষ্ট্রদূত, মোরার পিতা এক নতুন চাল চাললেন। বাঁকাপথে ছেলেকে ফেরাতে চাইলেন তিনি। যথাসময়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য একটা জরুরী চিঠি এসে পৌঁছুলো মোরার হাতে। দিশে হারিয়ে মোরা ছুটে গেলেন, জুলির কাছে গভীর রাত্রে। জুলির শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় মোরার আঙুলের টোকা পড়ল। আর দরজা খুলেই জুলি কেমন অবাক হয়ে দেখলেন কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে মোরাকে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে গালের রং, কপালের উপর এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চুল, উত্তেজনায় কাঁপছে তার শরীর। জুলি তাঁর দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই যেন বুঝে নিলেন ব্যাপারটা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষের দিকে নিজেরই আগ্রহে বাড়িয়ে দিলেন দুহাত। উন্মত্ত এক তা ঢেউ-এর মত তিনি যেন তারপর ভাসিয়ে দিলেন মোরাকে।

কয়েকটি দিনরাত্রি, ওরা বাইরের জগতের কোনো সংবাদই রাখলেন না। কেবল মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য এক শারীরিক কষ্ট মোরাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এবং অবশেষে সেই ভয়ংকর দিনটা এলো, দুহাতে বুক চেপে কাশতে কাশতে মোরার মুখ দিয়ে রক্ত বেরলো গলগল করে। কয়েকটা দিন তারপর তিনি অজ্ঞানের মত জ্বর গায়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। ডাক্তাররা ভালো করে পরীক্ষা করে মোরার রোগটাকে যক্ষ্মা বলে সন্দেহ করলেন। ভয়ানক বিশ্রী ধরনের রোগ, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় রোগীকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্পেনের সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়া দরকার। মোরার পরিবারের লোকেরা জুলির বাহুবন্ধন থেকে নিষ্ঠুরের মত ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে ডাক্তারের নির্দেশে।

'তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো জুলি, আমি সুস্থ হয়ে ফিরে আসব।'

যাত্রার প্রাক্কালে অসহায় দুর্বল গলায় মোরা বার বার সান্ত্বনা দিলেন জুলিকে। কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় তাঁর মুখ দিয়ে কয়েক

ফোঁটা রক্ত পড়ল, কান্নায় চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। আর সেই শুন্য প্রাসাদে জুলি অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কিন্তু জুলি কী মোরার প্রেমে একনিষ্ঠ ছিলেন? মাঝে মাঝে নিজেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন বার বার। আর এ জাতীয় ভাবনার মুহূর্তেই তিনি মোরার মুখের পাশে আর-একটি তরুণের মুখ ভেসে উঠত দেখেছেন নিজের মনের আয়নায় মোরার মতই সেই দশ বছরের ছোট যুবা পুরুষটিও তাঁকে আলোড়িত করছে গত দীর্ঘ ছ সপ্তাহ ধরে।

অথচ ঘটনাটা প্রাথমিক অবস্থায় কত সহজ এবং সাধারণই না ছিল মোরার প্যারিস ছাড়বার ছ সপ্তাহ আগে এক ভোজসভায় জুলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল জাকুইস ডি গাইবার্টে-এর। সুন্দর সুপুরুষ যুবক, জুলির থেকে বছর দশেকের ছোট; শৌখিন মেজাজ একটা নতুন ধরণের নাটক লিখেছিলেন জাকুইস। আশা ছিল রঙ্গমঞ্চে সেটা অভিনীত হোক। কিন্তু থিয়েটারের দরজায় দরজায় ঘুরেও তিনি যখন তার নাটকটি অভিনয়ের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না, তখন একদিন তার এক বন্ধু পরামর্শ দিল ও লর্ডি লেস্‌পিনেস্‌কে গিয়ে ধরতে প্রচুর থিয়েটারের মালিক ও অভিনেতা অভিনেত্রার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তার ফলে জুলির সঙ্গে ভোজসভায় পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাকুইস নতজানু হয়ে তার পদপ্রান্তে বসে পড়লেন আর প্রায় উন্মাদের মত জুলির স্তুতি করে যেতে লাগলেন একনাগাড়ে। প্রথমে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন জুলি, পরে যুবকটির প্রতি মায়া জাগল এরপর থেকে প্রতিদিন জাকুইস দেখা করতে লাগলেন জুলির সঙ্গে আর আস্তে আস্তে তার সৌন্দর্য, তার বুদ্ধিমত্তায় মোহিত হয়ে গেলেন ভুলে গেলেন নাটকের কথা, উন্মত্তের মত তিনি অবশেষে ভালোবেসে ফেললেন জুলিকে।

আর জুলিরও তখন বড় নিঃসঙ্গ জীবন। মোরাকে স্পেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুস্থ হয়ে ওঠার আশা তাঁর অনিশ্চিত এবং অন্যদিকে বয়সও বেড়ে যাচ্ছে জুলির হাতের কাছে জাকুইস ছাড়া অন্য

কোনো জোরদার অবলম্বন আর নেই। ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি।

আর সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিলেন জাকুইস। এক সন্ধ্যায় তিনি জুলিকে নিয়ে গেলেন একটা অপেরা দেখাতে। সেখানে সাটিনে মোড়া, বন্ধ দরজা নির্জন বক্সে বসে উন্মত্তের মত জাকুইস জুলিকে আলিঙ্গন করে বসলেন। জুলিও যেন মোরার কথা ভুলে গেলেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য, জাকুইসের বাহুবন্ধনকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে মনে হল। বিনা দ্বিধায় ধরা দিলেন তিনি

এরপর প্রেম দানা বেঁধে উঠল জুলি আর জাকুইসের মধ্যে জুলি সমান আন্তরিকতার সঙ্গেই দুজন প্রেমিকের চিঠির উত্তর লিখতে লাগলেন যদিও মাঝে মাঝে একটা পাপবোধ মনের মধ্যে সাড়া তুলত তাঁর, কী যে করা উচিত সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারতেন না। বলে চোখের সামনের প্রেমিকটিকেই বেশী করে আকর্ষণ করতে লাগলেন

দূর থেকে নিয়মিত চিঠি আসত মোরার। 'তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও আমার ভাল লাগছে না। আমি এখানে এক বন্দীর জীবন যাপন করছি। সময় বা সুযোগ পেলেই আমি এদের হাত এড়িয়ে তোমার কাছে পালিয়ে যাবো। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। জুলি।' সুন্দর ঝকঝকে হস্তাক্ষরে স্পেনের সমুদ্র উপকূল থেকে চিঠি লিখতেন মোরা প্রতিদিন। সেইসব চিঠির উত্তর লিখতে বসে অযথা যেন হাতের আঙুলগুলো কেঁপে যেতো জুলির, কান্নার বাষ্প জমে উঠত বুকের ভেতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হয়ত জাকুইস এসে দাঁড়াতেন ঘরের দরজায়, জুলি একবার জাকুইসের দিকে তাকাতেন, একবার টেবিলের উপর মোরার খোলা চিঠিটার দিকে। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। সেই সময় চিঠির মোরাকে বড় দূরের মানুষ বলে মনে হত তাঁর, যেন অস্পষ্ট প্রাণহীন অস্তিত্বহীন মানুষ বলে ভ্রম হত। আর সেই মুহূর্তেই তিনি চোখ খুলে তাকাতেন জাকুইসের

দিকে। জ্বলন্ত যৌবন নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দরজার কাছে দাঁড়ানো তাঁর একমাত্র প্রেমিকেকই যেন দেখতে পেতেন তিনি জাকুইসের মধ্যে। টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় পড়ে থাকত মোরার চিঠি, জুলি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে জাকুইসের অলিঙ্গনে ধরা দিতেন।

অথচ তখন জানতেন না জুলি পাগলের মত অসুস্থ শরীরে তাঁর কাছে ছুটে আসছে মোরা দূর থেকে, সমস্ত আত্মীয়স্বজনের হাত এড়িয়ে ডাক্তারদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে। আর সেকী দুঃসহ যাত্রা তাঁর। ভাঙা একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে মাদ্রিদের পাহাড় পেরিয়ে উন্মাদের মত তখন ছুটে আসছিলেন মোরা। কী করে যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর হাতে আর বেশী সময় নেই. অথচ জুলিকে একটিবার মাত্র না দেখে তিনি কিছুতেই মরতে পারে না। যেমন করেই হোক শেষ মুহূর্তের আগে তিনি গিয়ে পৌঁছুবেন জুলির কাছে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই সুরু করেছিলেন তাঁর যাত্রা। একমুহূর্তের জন্য বিশ্রাম না করে ছুটছিল মোরার ঘোড়ার গাড়ি। আর যাত্রাপথের প্রতিটি বড় বড় শহরে নেমে মোরা ভ্রমণের সমস্ত কিছু বর্ণনা করে চিঠি লিখছিলেন জুলিকে।

কিন্তু যতই কাছাকাছি হচ্ছিলেন জুলির, ততই মোরার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছিল। গলা দিয়ে রক্ত উঠছিল সময়ে অসময়ে। আর বোরডেক্সে পৌঁছবার পর শরীরে আর এক ফোঁটাও শক্তি অবশিষ্ট রইল না তাঁর। পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, অসহায় মোরা অস্ফুটে একবার জুলির নাম উচ্চারণ করে গাড়ির উপর ঢলে পড়লেন। বুকের ভেতর একটা প্রবল আলোড়ন উঠল, নাড়া খেল শরীরটা একবার, তারপর মুহূর্তের মধ্যে সব শান্ত হয়ে গেল। গাড়ির ভেতর গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সময় তার শীর্ণ আঙুল থেকে ছিটকে পড়ল জুলির দেওয়া সুন্দর আঙটিটা। জুলির জীবনের সবচেয়ে পবিত্র সুন্দর অধ্যায়টা শেষ হয়ে গেল এইরকম অসহায় ভাবে।

মোরার মৃত্যুর খবরটা পৌঁছুলে দিশেহারা জুলি যেন আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরলেন জাকুইসকে, তাঁর মনে কেমন যেন একটা ভয়

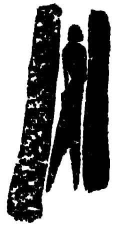
ঢুকল, মোরা গেছে, হয়ত এবার জাকুইসও যাবে। উন্মাদিনীর মত জাকুইসের চোখের সামনে নিজেকে নানাভাবে তুলে ধরতে লাগলেন জ্‌লি। মোরা গেছে যাক, কিন্তু জাকুইসকে তিনি কিছুতেই হারাতে পারবেন না।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সব কিছু জানা গেল। কিছুদিন থেকেই জ্‌লির প্রাসাদে জাকুইসের আনাগোনা কমে এসেছিল, তারপর একদিন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে তারপর জাকুইস এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে করে বসলেন, এক ধনীর একমাত্র রূপসী কন্যাকে

যথাসময়ে সংবাদটা এসে পৌঁছুলো জ্‌লির কানে। শান্ত হয়ে সংবাদটা শুনলেন তিনি, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত তারপর আস্তে আস্তে উঠে শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকলেন। এক এক করে ঘরের সব কটা আলো দিলেন জ্বেলে, তারপর গোপন দেরাজ থেকে বের করে আনলেন বোরডেস্ক থেকে লেখা মোরার শেষ চিঠিটা।

'আমি আসছি জ্‌লি, দমকা হাওয়ার বেগে ছুটে আসছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।' একপলক চিঠিটা খুলে পড়লেন তিনি। তারপর আফিমের বড় গুলিটা নিয়ে মুখে পুরে তিনি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন বিছানার কাছে। দমকা বাতাসে ঘরের ভেতর উড়তে লাগল মোরার চিঠিটা।

# নেপেল্‌সে প্লেগ



না, একমুহূর্ত সেদিন অন্য কথা চিন্তা করবার অবসর পাননি ডঃ অ্যাক্সেল মুন্থি। নেপেল্‌স থেকে জরুরী তাগিদ দিয়ে চিঠিটা এসে-ছিল আগের দিন সন্ধ্যেবেলা আর পরদিন ভোরে ল্যাপল্যাণ্ডের সেই ভ্রাম্যমাণ অবসরের দিনগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সকালের খালি ট্রেনটায় চেপে বসেছিলেন, যদিও অবস্থাটা কোন্‌ দিকে গড়াবে ভালো কবে বুঝে উঠতে পারেন নি তখনও। ববং কয়েকটা মাস অলসভাবে দিনযাপন করে তিনি ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠছিলেন, অতএব কাজের তাগিদ পেয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল তাঁর, একটা উত্তেজনাও বোধ করছিলেন মনে মনে।

বড় মন্থরভাবে ট্রেনটা তার যাত্রা শুরু করেছিল। কয়েক মাইল পার হতেই চাকায় দ্রুততা এলো। বেশ অদ্ভুত লাগছিল তাঁর ভোরবেলার ফাঁকা কামরায় একা একা যেতে। যদিও ট্রেনের কামরাটায় পুরু করে ছিটোন কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে নিঃশ্বাসটা

গুলিয়ে উঠছিল। কামরার জানালাগুলো ভালো করে খুলে দিয়েছিলেন তিনি। খোলা জানালা দিয়ে সকালবেলার হিম, কুয়াশা আসছিল আর মাঝে মাঝে শীতার্ত বাতাসের ঝাপটা লাগছিল চোখে মুখে।

তারপর সন্ধ্যেবেলা ট্রেন গিয়ে যখন পিজা স্টেশনে পৌঁছুল তখন কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগল অ্যাক্রেলের। স্টেশনটা একদম ফাঁকা, মানুষজন বলতে কেউ নেই। শুধু দুই একটা বেওয়ারিশ কুকুর বেঞ্চির তলায় গুটিসুটি মেরে ঘুমুচ্ছে। আর বাতাসে কার্বলিক অ্যাসিডের তীব্র গন্ধ। স্টেশন এলাকা ছাড়িয়ে শহরের রাস্তায় পা দিয়েই চমকে উঠলেন ডাক্তার। লম্বা লম্বা টানা একসার গাড়ি রাস্তা জুড়ে মন্থর ভাবে চলেছে মৃতদেহ বোঝাই হয়ে, দুর্গন্ধ উঠছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মৃতের শোভাযাত্রা দেখলেন তিনি। পচা গলা মৃতদেহের গন্ধে নিঃশ্বাস গুলিয়ে উঠল তাঁর, চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে গেল। একবার তার মনে হল আবার ঐ ফাঁকা স্টেশনটায় ফিরে যেতে, তারপর হাতের কাছে যে ট্রেন পাওয়া যায় সেই ট্রেনে চড়ে এই শহরটা ত্যাগ করে চলে যেতে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই বন্ধুর চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল। যখন এসেই পড়েছেন এ শহরে তখন বন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা না করে যাওয়াটা ভীষণ খারাপ দেখাবে। অতএব নাকমুখ বন্ধ করে ঠিকানা দেখে দেখে রাস্তা হাঁটতে লাগলেন অ্যাক্রেল।

ফাঁকা রাস্তা। মানুষজন বলতে দুই একজন বিষণ্ণ মুখ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার মানুষ। দোকানে দোকানে দরজা বন্ধ, মাঝে মাঝে দ্রুতগতি দুই একটা গাড়ির যাতায়াত আর সেই মন্থর লম্বা টানা গাড়িতে মৃতদেহের শোভাযাত্রা। যেন তিনি একটা ভৌতিক শহরে পা দিয়েছেন, মনে হল ডাক্তারের। চারিপাশ কেমন নীরব নির্জন, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গলার কয়েকটা ভাঙাচোরা কান্নার শব্দ। একসময় অনেক খুঁজে খুঁজে বন্ধুর বাড়িটা আবিষ্কার করলেন তিনি। সদর দরজাটা

খোলাই ছিল, বেল বাজাতে হল না তাঁকে। বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল সামনের ঘরেই। তারপর তাঁর মুখেই শহরের সেই ভয়ংকর কলেরার সংবাদটা শুনলেন তিনি। এ অবস্থায় কী যে করবেন তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না কয়েক মুহূর্ত। এই মৃত্যুপুরীতে থেকে কী লাভ তাঁর? প্রতি মুহূর্তেই এখানে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল। অথচ বুকের মধ্যে ডাক্তারী শাস্ত্রের আদর্শবাদও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বন্ধুর কাছ থেকে ঘণ্টা খানেকের সময় চেয়ে নিয়ে একটা ফাকা ঘরে গিয়ে বসলেন তিনি।

তারপর একটা ঘণ্টা চিন্তা ভাবনায় অস্থির ভাবে কাটল তাঁর। আর একসময় বন্ধুকে কিছু না জানিয়েই রাস্তায় নামলেন তিনি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন আবার সেই নির্জন ফাকা স্টেশনে। যেন নিজের অজান্তেই স্টেশন মাস্টারের কাছে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার প্রথম ট্রেনের সময়ের সংবাদ নিলেন। যে কোনো শহর হোক, রোম বা কালাবারিয়া, — আর এক মুহূর্ত এই মৃত্যু নগরীতে নয়। এই নরক থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। আগে নিজের জীবন বাঁচলে তবে ডাক্তারী জীবনের আদর্শবাদের কথা ভাবা যাবে। এই শহরে আর কিছু সময় থাকলেই তিনি মরে ভূত হয়ে যাবেন এই আশঙ্কায় মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল তাঁর।

কিন্তু ডাঃ অ্যাক্সেল মুন্থির ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে বিষণ্ণ হাসলেন স্টেশন মাস্টারটি। সেই বিষণ্ণ প্রৌঢ় মানুষটি তারপর তাঁকে সবিনয়ে জানালেন, পরদিন দুপুরের আগে পর্যন্ত কোনো ট্রেন চলাচলের সংবাদ তাঁর জানা নেই। আর দুপুরেও যে কোনো ট্রেন আসবে এমনও ভরসা নেই। কলেরার প্রকোপটা না শেষ হওয়া পর্যন্ত এদিকে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হবে বলেই সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতএব।

ডাক্তার আর কিছু ভাবতে পারলেন না। চোখের সামনে অন্ধকার দেখলেন। একপলকে মনে হল শহরটা যেন তাঁকে গ্রাস

করার জন্য তার লম্বা লম্বা কালো পীচের বাহুগুলো মেলে ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। আর কোনো নিস্তার নেই তাঁর। নিশ্বাসটা যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, অজানা আতঙ্কে হাত-পাগুলো অসাড় অসাড় বোধ হতে লাগল তাঁর দিশে হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে স্টেশনের ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে পড়লেন ডাঃ অ্যাক্সেল মুন্থি। তারপর একসময় দমবন্ধ অবস্থাটা কেটে গিয়ে কিছুটা সহজ হল মন। তখন কেমন যেন একটা মরিয়াভাব দেখা দিল তাঁর। যা হবার হোক। যখন পালানোর কোনো রাস্তা নেই তখন দেখাই যাক না কী হয়! এই চিন্তায় কিছুটা সাহস পেলেন মনে মনে।

এরপর রাত ঘন হবার আগেই তিনি পৌঁছে গেলেন বন্ধুর বাড়িতে। আর সান্তামাদেলিনা কলেরা হাসপাতালের একজন ডাক্তার নিযুক্ত হয়ে গেলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। শহরের অন্যান্য ডাক্তারেরা এসে সস্নেহে হাত রাখলেন ডাঃ অ্যাক্সেলের কাঁধে, বার বার হাত চেপে ধরলেন বন্ধু। অকৃত্রিম উষ্ণতায় চোখের কোণগুলো ভিজে উঠল তাঁদের। আর জীবনে সেই প্রথম যেন এক অদ্ভুত আবেগ নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করলেন ডাক্তার অ্যাক্সেল। নিজেকে ভীষণ সাহসী আর মানবদরদী বলে মনে হল তাঁর।

এরপর দুটো দিন কাটল তাঁর হাসপাতালের ভেতর, মুমূর্ষু রোগীদের বিছানার পাশে পাশে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলেন তিনি, যদি সত্যিকারের কাজ করতে হয় তাহলে হাসপাতালে বসে থাকলে চলবে না. যেতে হবে শহরের নোংরা বস্তি-গুলোর মধ্যে, সেই সব দুর্ভাগা পীড়িতদের বিছানার পাশে, যাদের সামর্থ্য নেই দুর্বল অবস্থায় গাড়ি ভাড়া করে হাসপাতালে আসার। এবিষয়ে মনস্থির করতেও তাঁর বেশীক্ষণ লাগল না। নতুন এক উদ্দীপনার জোয়ার এল রক্তে, বুকের মধ্যে। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ওষুধপত্তরের ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তার

নোংরা বস্তির অলিগলিতে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল তাঁর—কত অসহায় মানুষের জীবন, কী মর্মান্তিক এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জিবের মত বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা! যদিও মানুষগুলোর খোলা চোখ, বিবর্ণ দৃষ্টি, শব্দহীন হাঁ-করা মুখ আর ঠাণ্ডা শীতল শরীর-গুলোকে প্রথম দর্শনে দেখলে মৃত বলে ভুল হয়, অথচ ঐ শরীর-গুলোর গভীরে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে জীবন-প্রবাহ চলেছে। মানুষ-গুলোর পাশে বসে গায়ে হাত দিয়ে এক এক সময় মনে হয়েছে তাঁর—এদের কী কোনো বোধশক্তি আছে? এরা কী কিছু বুঝতে পারছে? না, জীবনের সমস্ত বোধ বুদ্ধি হারিয়ে এরা কেবল জড়পদার্থের মত অন্তিম মুহূর্তের জন্য নারবে অপেক্ষা করে আছে। মাঝে মাঝে পুরুষ নার্সের দল আসছে, দুই এক চামচ করে ওষুধ যান্ত্রিকভাবে ঢেলে দিচ্ছে রুগীদের গলায়। সময়ে অসময়ে এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে মাতাল সৈন্যবাহিনী, একপলকে যাকে মৃত বলে মনে হচ্ছে তাকেই নিয়ে তুলছে ঐ লম্বা লম্বা শবের গাড়িগুলোর উপর। ভালো করে খোঁজ নিচ্ছে না মানুষটা সত্যিই মরে গেছে কিনা। তারপর শবের গাড়ি মন্থর ভাবে রাস্তা দিয়ে চলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কোলারোসির মস্ত গর্তটার পাশে, গাড়ি বোঝাই মৃত-অর্ধমৃত শবের বোঝা ঐ গর্তের ভেতর ফেলে দিয়ে আবার শহরের বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি-গুলো। শ'য়ে শ'য়ে অর্ধমৃত জীবন্ত মানুষেরও সমাধি রচিত হচ্ছে ঐ মস্ত গর্তটার ভেতর

কলেরা মহামারীর অবস্থাটা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল, অ্যাক্রেলের তখন আর এ-সব চিন্তা-ভাবনাও মনে রইল না। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মরছে, তড়িতাহতের মতো হঠাৎ, আচমকা মানুষগুলো মেঝেতে, রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। দুর্গন্ধে বাতাস ভারী; স্নান, খাওয়া, ঘুমোনোরও সময় পাওয়া যাচ্ছে না। পাগলের মত ছোটাছুটি করছেন শহরের ডাক্তারকূল। ভয়াবহ সব দৃশ্য চতুর্দিকে। এর মধ্যে এক সকালে মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটল ডাঃ অ্যাক্রেলের চোখের সামনে।

সরকারী গাড়িতে করে বাঁধা সময়ের জন্য কয়েদীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গেছেন সেদিন গ্রান্তিলোতে। দুপুর নাগাদ পরীক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, গাড়ির ভেতর বৃদ্ধ সোফারটি মরে পড়ে আছে। অথচ সকালেও যখন মানুষটি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তখনও মোটামুটি সুস্থ ছিল সে। সেই মানুষটাকে এমন অদ্ভুতভাবে মরে যেতে দেখে সমস্ত শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল ডাক্তারের। বাঁচবার আর কোনো আশা দেখতে পেলেন না তিনি। শহরটাকে রোগমুক্ত করবারও আর কোনো আশা নেই মনে হল তাঁর। হাতের কাছে একজনও মানুষ পেলেন না সাহায্য করবার। অগত্যা মৃতদেহ সমেত গাড়িটা নিজেই চালিয়ে নিয়ে নেপেল্‌স ফিরলেন তিনি সন্ধ্যে-বেলা। বৃদ্ধটির মৃতদেহ সৈনিকদের হাতে জমা দেবার সময় অকারণেই চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল তাঁর। বড় সহৃদয় আর স্নেহময় ছিল বৃদ্ধচালকটির উপস্থিতি।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আতঙ্কে ঘুম আসত না তাঁর। পরিশ্রমে অবসাদে চোখের পাতা দুটো কেবল ভারি হয়ে উঠত, অথচ পরিপূর্ণ ঘুম আসত না। ছাড়া ছাড়া ঘুম লেগে থাকত চোখে, সারাদিনের দুই-একটা বীভৎস দৃশ্যের স্মৃতি মনে পড়ে যেত, আতঙ্কে চোখের পাতা দুটো লাফিয়ে উঠত, ভেঙে যেত তন্দ্রা। একা বিছানায় ভয়ে আতঙ্কে যেন দমবন্ধ হয়ে আসত, ছুটে বেরিয়ে আসতেন তিনি রাস্তায়। সান্তামারিয়া চার্চে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। দেওয়াল ঘেঁষে পাতা একটি লোহার বেঞ্চের উপর গুটিসুটি হয়ে বসতেন, সারা রাত্রি ধরে লাল নীল মস্ত মস্ত মোমের আলো জ্বলত সেখানে। এক সময় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে নির্বিঘ্নে ঘুম নেমে আসত চোখে. ঈশ্বরের কোলের কাছে শুয়ে পরম বিশ্বাসে শিশুর মতন গাঢ় তন্দ্রা আসত তাঁর চোখে।

কলেরা বা মৃত্যুর থেকে যা ভয়াবহ বলে মনে হতে লাগল অ্যাক্সেলের, তা হল মস্ত মস্ত ইঁদুরের পাল। ঠিক সময় বুঝে যেন

হাজারে হাজারে ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুর এসে উপস্থিত হয়েছে শহরে। বেপরোয়া ভাবে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, বাড়িতে, হাসপাতালে। একটি দিনের ঘটনায় ঐ ইঁদুরগুলোর বিষয়ে ভীষণ ভয় ঢুকল ডাক্তারের মনে। সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটা ভাঙাচোরা বাড়ির নীচের তলার একটি ঘরে একজন অন্ধ বুড়ির খোঁজখবর নিতে গেছেন। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। ঘরের ভিতর টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে, ছেঁড়া ময়লা বিছানায় উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে অন্ধ অর্ধমৃত বুড়িটা আর তার চারপাশ ঘিরে শ'য়ে শ'য়ে ইঁদুর স্থির হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে বুড়িটা গোঙানির মত 'হেট, হেট' করে শব্দ করছে মুখ দিয়ে কিন্তু ইঁদুরগুলো তাতে একটুও বিচলিত হচ্ছে না। বরং স্থির শান্ত হয়ে বুড়ির বিছানার চারপাশ ঘিরে আছে। ভয়ে শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল অ্যাক্সেলের। গলা ফাটিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন! একটি পলকের জন্য ইঁদুরগুলো তাদের ঘাড় ঘুরিয়ে হিংস্র শীতল চোখে দরজার কাছে ডাক্তারের দিকে তাকাল, তারপর পরম অবহেলায় আবার বুড়ির দিকে দৃষ্টি ঘোরাল তারা। তাদের ঐ শীতল হিংস্র নির্বিকার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ঘরের ভেতর একটা পা বাড়াতেও সাহস হল না তাঁর। এক দৌড়ে সেখান থেকে চলে এলেন তিনি। ছুটতে লাগলেন শহরের সৈন্যবাহিনীর দপ্তরের দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই কিছু করা দরকার না হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইঁদুরগুলো অধীর ঐ অর্ধমৃত অন্ধ বুড়িটার উপর লাফিয়ে পড়ে দাঁতে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে।

আর সেই দিনই শহরের সবচেয়ে নোংরা বস্তিটা থেকে সেই ভয়াবহ সংবাদটা পাওয়া গেল। হাজারে হাজারে পাগলা ক্ষ্যাপা ইঁদুর বস্তিবাসীদের আক্রমণ করেছে। যুবক বৃদ্ধ শিশুর দল উন্মাদের মত রাস্তায় রাস্তায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, আর হাজারে হাজারে ইঁদুর তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্ত ধারালো দাঁত দিয়ে তাদের

ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী গাড়িতে করে অকুস্থলে চলে গেল।

আর সেই দিন সন্ধ্যেবেলা পর্যুদস্ত সৈন্যদল গাড়ি বোঝাই মৃত, অর্ধমৃত বস্তিবাসীদের নিয়ে পেলিগ্রিনি হাসপাতালে নিয়ে তুলল। শহরের লোকেরা বিস্মিত হয়ে দেখল, জীবন্ত অবস্থাতেই শিশুদের শরীরের অর্ধেক অংশ খেয়ে ফেলা হয়েছে, কোনো কোনো ব্যক্তির চোখের মণি গাল খুবলে তুলে নেওয়া। কারো কারো টুঁটি দাঁতে টিপে তখনও ইঁদুরের পাল ঝুলছে।

এরপর কয়েকটা দিন শহরের মানুষজন কলেরার ভয়াবহতার কথা একদম ভুলে গেল। হিংস্র ইঁদুরের পাল আর তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার উপায় নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে রইল রোজই শহরের কোনো-না কোনো অঞ্চল থেকে ইঁদুরের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যেতে লাগল। কোথায় কোন্ গুপ্ত গহ্বর থেকে হাজারে হাজারে সাক্ষাৎ-যম বেরিয়ে এসে অসহায় মৃত শহরটিকে আক্রমণ করে কয়েক দিনের মধ্যে উত্ত্যক্ত করে তুলল। আর যেন সময় বুঝেই কলেরার সঙ্গে সঙ্গে প্লেগের প্রকোপও দেখা দিল শহরে। রাস্তাঘাট মৃত ইঁদুরের বোঝায় ঢেকে গেল, পালে পালে ইঁদুরের সঙ্গে মরতে লাগল মানুষজনও।

দিনরাত্রিগুলোর আর কোনো হিসেব রইল না ডাক্তারের। সময় বয়ে গেল অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে। শেষে একটু একটু করে কলেরা ও প্লেগের প্রকোপ কমতে শুরু করল। এতদিনে ভয়াবহ অবস্থার হাত থেকে যেন কয়েক মুহূর্তের বিশ্রাম পেলেন ডাক্তার অ্যাক্সেল।

কিন্তু ঘটনা ঘটল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা কিছু সময় অবসর পেয়ে একটি পরিচিত পানশালার নির্জন অংশে একা বসে আস্তে আস্তে মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বিভিন্ন সব ঘটনার কথা ভাবছিলেন ডাক্তার। হঠাৎ বন্ধুর বাড়ির বাচ্চা চাকরটা ছুটতে ছুটতে এসে

একটুকরো কাগজ গুঁজে দিল তাঁর হাতে। অ্যাক্সেল তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলে পড়লেন।

'তাড়াতাড়ি একবার আসুন, আপনার বন্ধুর যেন কী হয়েছে।'

কী এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল তাঁর। আর এক-মুহূর্ত দেরি না করে অ্যাক্সেল গাড়ি হাঁকিয়ে গিয়ে পৌঁছুলেন বন্ধুর বাড়িতে। বিশাল লোহার আধভেজান দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজার কড়া নাড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে খুলে গেল দরজাটা, পরিচিত বারান্দাটা পার হয়ে অ্যাক্সেল কোনো কথা না বলে সোজা ঢুকে গেলেন বন্ধুর শোবার ঘরে। ঘরে টিমটিমে একটি আলো জ্বলছে, খাট ছেড়ে মেঝেতে মাদুরের উপর শুয়ে আছেন ডাক্তার ভিলারী। প্রথম এক-পলকে বন্ধুকে চিনতে যেন অসুবিধা হল অ্যাক্সেলের। দিনদুয়েক আগেও তো দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, কথাবার্তা হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কী ঐ হাসিখুশি নধর চেহারার মানুষটা শুকিয়ে এমন কিম্ভূত চেহারার হয়ে যেতে পারে! মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠল তাঁর। বন্ধুর গায়ে হাত রাখলেন ডাক্তার অ্যাক্সেল। শীতল শরীর, চোখের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করলেন, না এখনও আবছাভাবে প্রাণটা জেগে আছে। দৃষ্টিটা আপনা থেকেই ঝাপসা হয়ে এল তাঁর, চোখের সামনে এ কার মুখ দেখলেন তিনি, এতো তাঁর বন্ধুর সেই হাস্যোজ্জ্বল সুখী সুখী আদর্শবাদী মুখ নয়। এ অন্য একটা মুখ, ভয়ংকর, কুৎসিত একটা মুখ। হ্যাঁ, ও মুখ মৃত্যুর, বুঝলেন ডাক্তার অ্যাক্সেল। আস্তে আস্তে ভিলারীর বোজা চোখের পাতা দুটো খুলে গেল একসময়। চোখের দৃষ্টিটা যেন একমুহূর্তের জন্য প্রখর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠাণ্ডা নিরক্ত পাশে শোয়ানো হাতটা কেঁপে কেঁপে বিছানা ছেড়ে উপরে উঠল একটু, তাঁর ঠোঁট দুটোর মধ্যে অস্পষ্ট একটু শব্দ হল, প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁটের ধারটা একটু নড়ে উঠল। অ্যাক্সেল নিজের কানটা বন্ধুর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর বন্ধুর অস্পষ্ট জড়ানো গলার কথাটা শুনতে পেলেন।

'ধন্যবাদ, বন্ধু, ধন্যবাদ।'

ভিলারীর ঠোঁটে শব্দগুলো শেষবারের মত উচ্চারিত হয়ে এক সময় থেমে গেল। চোখের দৃষ্টিটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিছানায় শোয়ানো ডান হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠে এল খানিকটা। ডাক্তার বন্ধুর হাতটা ধরে ফেললেন মুহূর্তে। নিজের উষ্ণ হাতের ভেতর ঐ শীতল হাতটাকে ধরে রেখে তারপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি। আশ্চর্য, এই মানুষটার ডাকে সাড়া দিতে এসে তিনি এই ক'দিনে জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, তার বুঝি কোনো তুলনা নেই। আর এই আদর্শবাদী হাসিখুশি স্বভাবের মানুষটিরও তুলনা মেলা ভার এ জগতে। কী অসীম নিষ্ঠা আর কী পবিত্র আদর্শবোধ! মনে পড়ল তাঁর সেই প্রথম দিন স্টেশন থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে তিনি যখন বন্ধুকে হাসপাতালে কাজ নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন, তখন কেমন আনন্দে এই মানুষটির দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছিল জলের ধারা।

আমি জানতাম এ অবস্থায় তুমি এই পীড়িত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াবেই।'

ওই মানুষটির আন্তরিকতা, আবেগ তিনি যেন নিজের ভিতরেও অনুভব করেছিলেন কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে। এই মানুষটির জন্যই তিনি তার নিজের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা থেকে এক মহান পবিত্র জীবনে উন্নীত হয়েছিলেন কয়েক দিনের জন্য।

এক সময় খেয়াল হল তাঁর, হাতের মুঠোয় ধরা বন্ধুর হাতটা কখন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

তারপর ঘণ্টা দুয়েক বাদে ডাক্তার ভিলারীর মৃতদেহটাকে শহরের ঐ সাধারণ কলেরায় মৃত মানুষজনদের গর্তটার ভিতর আস্তে আস্তে নামিয়ে দেওয়া হল। শত শত নগণ্য মৃত মানুষের পাশে আর-একটি মৃত মানুষের দেহকেও নামিয়ে দেওয়ার সময় শহরের মানুষজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আচমকা কেঁদে উঠল। আর সেই মুহূর্তেই স্থির করে

ফেললেন ডাঃ অ্যাক্রেল মুন্থি, আব-একটা দিনও এ শহবে নয। কালই ভোরের ট্রেনে এই ভয়ংকর শহরটি ত্যাগ করে চলে যাবেন তিনি।

ক্রমে রাত্রিটা আরো গভীব হল। শহবের সমস্ত শব্দ আস্তে আস্তে নীরব হযে গেল। ডাঃ অ্যাক্রেল মুন্থি দীর্ঘ লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রেতের মত সেই নিদ্রিত শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেডাতে লাগলেন। এ-রাস্তা সে-বাস্তা, এ-গলি সে-গলি ঘুবে ঘুরে নগব পরিক্রমা শেষ হল তাঁর একসময়। তাবপর আস্তে আস্তে হেঁটে তিনি স্টেশনেব প্লাটফর্মে এসে ঢুকলেন।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সৈনিকেব মত তারপব ডাঃ অ্যাক্রেল মুন্থি সকালের প্রথম ট্রেনেব অপেক্ষা কবতে লাগলেন



# মৃত্যুর গহ্বরে

সেই শৈশব থেকেই বাবার সঙ্গে ওরেলীর কেটেছে সার্কাসের তাঁবুতে তাঁবুতে, ঘোড়ার পিঠে পা রেখে দাঁড়ানোর খেলা দেখিয়ে। মার কথা ভালো করে মনেই পড়ে না তাঁর। জন্ম দিয়ে মা যে কোথায় গেল আর খুঁজেই পাওয়া গেল না তাকে।

তিনটি বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় ঝলমলে পোশাকে সেই একই খেলা দেখাতে দেখাতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছেন কিশোর ওরেলী। দর্শকরাও কম ক্লান্ত হয়নি। সেই ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের তাঁবু থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে বেরিয়ে আসা, তারপর মাথার লাল টুপিটা শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি করতে করতে রিঙ-এর চারপাশে ক্রমান্বয়ে ঘুরতে থাকা। যেন আর শেষ নেই তার। অথচ ওরেলীর ইচ্ছে করে এমন সব খেলা দেখাতে যাতে দর্শকদের দম বন্ধ হয়ে যায়, বুকের ভেতর দুর্‌দুর্‌ করে হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে থাকে, বিস্ফারিত চোখে সেই খেলা দেখতে দেখতে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। এমন কোনো

রোমাঞ্চকর খেলা, যাতে উত্তেজনা আছে, আনন্দ আছে আর আছে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা। ইচ্ছেটা মনের মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরে কিশোর ওরেলীর। অথচ তেমন সুযোগ সুবিধা আসে না। আর প্রতিদিন সেই ঘোড়ার খেলা দেখাতে দেখাতে বিরক্তিতে, ক্লান্তিতে মনটা ভেঙে যেতে চায় তাঁর।

একদিন আর শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না ওরেলী। সকালবেলা সোজা গিয়ে হাজির হন সার্কাসের ম্যানেজারবাবুর ঘরে। হাসিখুশি গোলগাল চেহারার ম্যানেজার তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠেন।

'কী হে ক্ষুদে মাস্টার, খবর কি?'

'আমি আর ঐ ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা দেখাতে পারছি না। আমায় অন্য কিছু খেলার বন্দোবস্ত করে দিন।' এক নিঃশ্বাসে গড় গড় করে কথাগুলো বলে দম ফেলেন ওরেলী।

'অঃ তাই নাকি। তাহলে তো নিশ্চয়ই নতুন কিছু ব্যবস্থা করতে হয়।' কথার শেষে হা হা করে এলা কাটিয়ে হাসেন ম্যানেজারবাবু তারপর আচমকা চোখ গম্ভীর করে বলেন, 'বেশ, কয়েক দিনের সময় দাও আমায়, জোরদার দেখে একটা খেলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমার জন্য।'

এতদিনে নিশ্চিন্ত হন ওরেলী। একঘেয়ে ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে মনটা ভরে ওঠে তাঁর। এরপর কয়েকটা দিন কাটে তারপর গভীর এক উত্তেজনার মধ্যে, রাত্রে ভালো করে ঘুম আসতে চায় না। এ সময়ে সার্কাসের লোকজনদের মধ্যে অন্য একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। নতুন ভয়ংকর একটা সিংহ ধরে আনা হয়েছিল জঙ্গল থেকে। ওরেলীও সার্কাসের অন্য লোকজনদের সঙ্গে সারাদিন নতুন সিংহটাকে নিয়ে মেতে উঠলেন। বনের গন্ধ তখনও মুছে যায়নি পশুটার গা থেকে, সতেজ টাটকা বুনো চেহারা, গলার ডাকে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। পশুটার দৃপ্ত রাজকীয় চালচলন দেখতে সারাদিনই লোকের ভিড় জমে থাকে খাঁচাটার চারপাশে।

নতুন সিংহের উন্মাদনাটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল একদিন। আর শেষ পর্যন্ত এক ভোরবেলায় সার্কাসের ম্যানেজারবাবু এসে ঢুকলেন ওরেলীদের ঘরে। প্রথম কয়েক মিনিট ধরে হাসি ঠাট্টা চলল, গলা ফাটিয়ে হাসলেন তিনি তারপব আচমকা গম্ভীর মুখে নিজের কথাটা বললেন আস্তে আস্তে। ওরেলী তাঁর বাবার সঙ্গে বসে ম্যানেজারের কথাগুলো শুনলেন মন দিয়ে।

হ্যাঁ অনেক ভেবে চিন্তে, মাথা খাটিয়ে তিনি ওরেলীর জন্য একটা নতুন খেলা বের করেছেন। খেলাটা শুধু নতুনই নয় যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ। দিন কয়েকের মধ্যেই সাসেক্সে-এর সীমান্ত শহরে তাঁদের খেলা দেখানোর কথা আছে। নতুন খেলাটা সেখানেই প্রথম দেখানো হবে। অতএব সার্কাসপার্টি পৌঁছুনোর দিন দুই আগে মিঃ স্মিথ নাম নিয়ে ওরেলীর বাবা ওরেলীকে সঙ্গে করে শহরের এক মাঝারী হোটেলে বাসা বাঁধবেন। তারপর সার্কাস পার্টি শহরে পৌঁছিয়েই রটিয়ে দেবে তাদের নতুন সিংহ মালেকের খাঁচায় যদি কেউ একা ঢুকে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতে পারে তাহলে তাকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। খবরটা প্রচারিত হলে নিশ্চয়ই একটা নতুন উত্তেজনায় শহরের লোক ভেঙে পড়বে সার্কাসের তাঁবুতে। এবং তখন মিঃ স্মিথ নামধারী ব্যক্তি তাঁর ছেলে অর্থাৎ ওরেলীকে সিংহের খাঁচায় পাঠিয়ে দেবে। ফলে একটা নতুনত্ব পাবে শহরের লোক।

ম্যানেজারের কথাগুলো শুনতে শুনতে উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল ওরেলীর শরীর। ঠিক তাঁর মনের মত খেলা এটা। খেলা দেখতে দেখতে বিস্মিত দর্শকদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে, মাথার পাটকরা চুল খাড়া হয়ে উঠবে আর শরীরগুলো সব পাথর হয়ে যাবে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

উত্তেজনায় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলেন না ওরেলী। ম্যানেজারের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছুটে গেলেন মালেকের খাঁচার পাশে। গিয়ে দেখলেন বিশাল একটা মাংসের খণ্ড দাঁতে

নিয়ে চিবুচ্ছে মালেক আর মাঝে মাঝে বুক-কাঁপানো-গলায় গর্জন করে উঠছে। আর খাঁচার পাশে একটা টুলের উপর বসে এক দৃষ্টে মালেকের খাওয়া দেখছেন সিনর লিওনার্দো, সার্কাস জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি, সবচেয়ে হিংস্র আর বুনো পশুদের বশ করবার দক্ষতা যার অতুলনীয়। ওরেলী গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতেই লিওনার্দো তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ওরেলীর একটা হাত ধরে ফেললেন। তারপর কেমন ঘষা ঘষা কোমল গলায় বলতে লাগলেন :

'ম্যানেজারের কাছে থেকে শুনেছ তো সব। ভয় করছে নাকি। তা যাই বল, ওটা একটা সত্যিকারের সিংহ। এত জন্তু জানোয়ার ঘাঁটলাম কিন্তু এমনটি আর দেখিনি কখনও। ওকে বশ মানাতে সবচেয়ে বেগ পেতে হয়েছে আমাকে। কী কষ্টটাই না দিয়েছে ব্যাটা। প্রথম প্রথম ওর ডাক শুনে আমারই তো ভিরমি খাবার যোগাড়। জমবে ভালো। দেখো না, তুমি আমি আর ওটা কী খেলাটাই না দেখাই। সব ব্যাটা এবার কানা হয়ে যাবে।'

লিওনার্দোর কথা শুনতে শুনতে ওরেলী এক দৃষ্টে মালেকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে মুখ তুলে মালেক যখন গর্জন করছিল, ওরেলী তার মুখগহ্বরের সবটা দেখে নিচ্ছিলেন, সেই হিংস্র শক্ত দাঁতের সারি রক্তিম লাল জিহ্বা আর অতলস্পর্শী অন্ধকার। প্রথম দুই এক পলক বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল তারপরে ক্রমশ সহজ হয়ে গিয়ে সস্নেহে সে মালেকের দিকে তাকিয়েছিল।

এরপর—প্রথম দিন সন্ধ্যায় তাদের মিলিত অভিনয়টা জমল কিন্তু অদ্ভুত। প্রচলিত পুরোনো খেলাগুলো দেখানো শেষ হয়ে যাবার পর মালেকের বিশাল খাঁচাটা টেনে নিয়ে আসা হল সকল দর্শকের চোখের সামনে, সোনালী সুতোর কাজ করা রিঙ-এর মধ্যে। সবচেয়ে কড়া পাওয়ারের আলোগুলো দেওয়া হল জ্বেলে। এত মানুষের ও আলোর তলায় কয়েক মুহূর্ত খাঁচার ভেতর কয়েকবার পায়চারি করল মালেক

তারপর আচমকা খাঁচার লোহার গরাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জে উঠল। সে গর্জন যেমন ভয়ংকর তেমন গম্ভীর। মালেকের বিশাল শরীরের ধাক্কায় কেঁপে উঠল লোহার খাঁচাটা আর চতুর্দিক তার ডাকে গম গম করে উঠল। এতক্ষণ দুই একটা ফিস্‌ফাস্‌ কথা শোনা যাচ্ছিল, মালেকের গর্জনের পর সমস্ত শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই অবসরে ঝলমলে পোশাক পরে রিঙ-এর ভেতর এসে ঢুকলেন হাসিখুশি চেহারার ম্যানেজারবাবু। চারিপাশে দর্শকদের নুয়ে নুয়ে অভিবাদন জানিয়ে হাতের গোটানো চাবুকটা ছুঁড়লেন একবার শূন্যে, একটা ধারালো শিসের মত চাপা ক্রুর শব্দ করে চাবুক লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কেমন খুটুকে গলায় চীৎকার করে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি তারপর।

'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, এই সার্কাস খেলার জগতে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, সবচেয়ে ভয়ংকর ও বিপদসঙ্কুল খেলা দেখাব বলে আমরা মনস্থ করেছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা এই খাঁচায় বন্দী পোষ-না-মানা বুনো ও হিংস্র সিংহটাকে দেখে নিয়েছেন ভালো করে। যখন আমি এই পশুটির সম্বন্ধে বলেছি পোষ-না-মানা তখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এটিকে পোষ মানানো কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ সিনর লিওনার্দো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হিংস্র পশুদের শিক্ষক। আজ কয়েক মাস ধরে শত চেষ্টা করেও এই হিংস্র প্রাণীটিকে বশ মানাতে পারেন নি। আর তিনি যখন এই পশুটিকে বশ মানাতে পারেন নি তখন এই পৃথিবীতে আর কারো পক্ষে এই কাজটা সম্ভব নয়। এই পশুটির বিষয়ে লিওনার্দোর মতামত অনুসারে বলতে পারি, যতই হিংস্র পশুই হোক না কেন কিছু না কিছুকে তারাও ভয় পায়, অতএব সেই সব জিনিসের সাহায্যেই তাদের বশ করা যায় কিন্তু লিওনার্দো বলেছেন এই পশুটি কোনো কিছুকেই ভয় পায় না। তিনি একজন সত্যিকারের খেলোয়াড়ের মতই তাঁর অক্ষমতাটা স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও পশুটিকে বশ করবার উৎসাহ বা চেষ্টা তিনি এখনও হারান নি।

অতএব ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ আজ রাতে সেই অসমসাহসী ও সুদক্ষ মানুষটি শেষবারের মত আপনাদের চোখের সামনে প্রায় নিবস্ত্র অবস্থায় খাঁচায় ঢুকে একবার পশুটিকে পোষ মানানোর চেষ্টা করে দেখবেন।'

নাটুকে ভাষায় তাঁর বক্তব্য শেষ করে ম্যানেজার ঘাড় ফিরিয়ে একবার রিঙে ঢুকবার প্রবেশ পথের দিকে তাকালেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ পথে দেখা দিলেন সিনর লিওনার্দো। নীল ও সোনার জলের কাজ করা পোশাক পরে রাজকায় কায়দায় ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে রিঙ-এর ভেতর ঢুকলেন তিনি। তারপর তাঁর বিশাল সবল শরীর ঝুঁকিয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন নীরবে, আস্তে আস্তে লোহার খাঁচাটার চারপাশ ঘুরে ঘুরে দুই একবার হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে পরীক্ষা করলেন খাঁচাটা। যতবারই লিওনার্দো খাঁচাটা পরীক্ষা করবার জন্য মোটা মোটা শিকগুলোয় হাত দিলেন ততবারই মালেক প্রচণ্ড গর্জন করে উঠে হিংস্র থাবা মেলে তার হাতটা ধরতে গেল। লিওনার্দো অসাধ্য নিপুণতার সঙ্গে হাতের মুঠোটা সরিয়ে নিলেন প্রতিবার। খাঁচার পরীক্ষা শেষ করে দুবার হাততালি দিলেন সেই হাততালির সঙ্গে সঙ্গে বন্য শিকারীর পোশাকে দুজন মানুষ দুটো বিরাট বিরাট বন্দুক বাগিয়ে ছুটে এল। ওবেলী দর্শকদের মধ্যে বসে লক্ষ করছিলেন পুরো ব্যাপারটাই এমন সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যে ঘটনাটা যে পুরোপুরি সাজানো তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না। বরং অত্যন্ত সহজভাবেই একটার পর একটা এগিয়ে যাচ্ছিল।

দুটি বিশাল বন্দুক বাগিয়ে খাঁচার দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে গেলে পর লিওনার্দো আস্তে আস্তে খাঁচার সামনের সরু পাটাতনটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে খাঁচার সামনের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে মালেক একবার প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল, আর বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচার ভেতরের দরজাটার উপর। ঝনঝন শব্দ করে কেঁপে উঠল খাঁচাটা। মহিলা দর্শকরা কেউ কেউ ভয়ে

চীৎকার করে উঠলেন। লিওনার্দো লাফ দিয়ে খাঁচার অন্য পাশে এলেন, মালেকও লাফিয়ে পড়ল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। এইবারে মানুষ আর হিংস্র পশুতে বন্ধ খাঁচার ভেতর লাফালাফি চলল মিনিট পাঁচেক ধরে। আর এই অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পেলো লিওনার্দোর কপালে ঘাম জমেছে। দুই একবার অসহায় পলক ফেলে দর্শকদের দিকে তাকিয়েছেন তিনি, কেঁপে উঠেছে তাঁর শরীর আতঙ্কে, ভয়ে। ওরেলী কিন্তু মনে মনে বুঝেছে লিওনার্দোর ওই অসহায় দৃষ্টি, আতঙ্কিত শরীর কাঁপানো সমস্তই মিথ্যে, নকল অভিনয়। এক পলক বিশ্রাম নেবার, দম ফেলবার জন্য খাঁচার পাশে লটকানো লাল ঝালরের উপর হাত রেখে যেই দাঁড়িয়েছেন লিওনার্দো, অমনি কোথা থেকে থলথলে শরীর নাচিয়ে ছুটে এসেছেন ম্যানেজারবাবু আর সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করেছেন গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে,

'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমি দুঃখিত, আমি আপনাদের কাছে মার্জনা চাইছি, কিন্তু এ-খেলা আর নয়। আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠছে পশুটার মেজাজ। এ অবস্থায় ওর খাঁচায় ঢোকা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। অতএব আমি দুঃখিত এ খেলা এখনই বন্ধ করা দরকার।'

ম্যানেজারবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রিঙের ভেতর থেকে লিওনার্দোর ভারী গম্ভীর গলাটা শুনতে পেয়েছে দর্শকেরা।

'না, না তা হতে পারে না, লিওনার্দো কোনোদিনই তার দর্শকদের নিরাশ করেনি আজও করবে না। আমি ওর খাঁচায় ঢুকবোই।'

লিওনার্দোর গলাটা চুপ করে যেতেই দর্শকদের ভেতর থেকে তুমুল হাততালির শব্দ উঠেছে। সেই তুমুল শব্দের মধ্যেও লিওনার্দোর নির্দেশে দুজন দুপাশে খাঁচার ভেতরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে দিয়েছে আর রাজকীয় কায়দায় ভেতরের খাঁচায় পা দিয়েই লিওনার্দো পকেট থেকে সোনালী রঙের একটা পিস্তল বাঁ হাতে তুলে নিয়েছেন আর ডান হাতের মুঠোয় চাবুকটা শক্ত করে ধরে এক পা এক পা

করে এগিয়ে গেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হিংস্র গর্জন তুলে তাঁর গায়ের উপর লাফিয়ে পড়েছে মালেক। লিওনার্দো তড়িৎ-এ পাশে সরে গিয়ে বাঁ হাতের পিস্তল ও ডান হাতের চাবুক তুলে মালেকের দিকে লক্ষ্য করে ফাঁকা আওয়াজ করে পেছনের দরজাটা খুলে দ্রুত পায়ে নেমে এসেছেন রিঙ-এর মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চীৎকার ও হাততালিতে সার্কাসের তাঁবুটা যেন ফেটে গিয়েছে।

তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত লিওনার্দো খাঁচার একপাশে টুলের উপর বসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে দর্শকদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছেন। এই সময় দর্শকদের ভেতর লুকিয়ে থাকা সাদাসিধে পোশাকের জো হঠাৎ নির্দেশমত লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠেছে,

'যত সব ধাপ্পাবাজি, বুজরুকী ?'

ম্যানেজারবাবু ঠিক সময় মত রিঙ-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে জো-র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন অবুঝের মত, কী বলছেন মশাই, কোনটা ধাপ্পা, কোনটা বুজরুকী।'

'আপনাদের এই সিংহের খেলাটা মশাই। স্রেফ ধাপ্পাবাজির খেলা।'

'এ কী বলছেন আপনি ? এটা ধাপ্পার খেলা ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে ধাপ্পা।'

'আপনি ঠিক জানেন।' কেমন ন্যাকা গলায় প্রশ্ন করছেন ম্যানেজারবাবু।

'হ্যাঁ ঠিক জানি।'

'বেশ, তাই যদি হয় তবে নেমে আসুন আসন থেকে। খাঁচার ভেতরে ঢুকে সাহস দেখিয়ে প্রমাণ করে দিন যে এটা বুজরুকীর খেলা।' রাগের সঙ্গে কেমন ঠাট্টা মিশিয়ে কথা বলেছেন ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার পাশের টুল ছেড়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়েছেন লিওনার্দো। তারপর দুজন সঙ্গীকে খাঁচার দুপাশে রেখে সদর দরজাটার সামনে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

'কই কী হল মশাই, চলে আসুন, প্রমাণ করে দিন খেলাটা ধাপ্পা, আসুন।'

নকল একটা ঠাট্টায় গলায় হুংকার দিয়ে উঠেছেন ম্যানেজার। আর তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ভেতর থেকে প্রচণ্ড গলায় গর্জন করে উঠেছে মালেক। সেই চীৎকারে দর্শকের আসন থেকে নেমে একটা পোষা ভাঁড়ের মত সার্কাসের তাঁবুর সদর দরজা দিয়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে জো। দর্শকরা তার পালানোর ভঙ্গী দেখে চীৎকার করে হেসে উঠেছে, বিড়ালের ডাক ডেকেছে। দর্শকদের হৈ হট্টগোল থেমে যাবার পর বেশ শান্ত ভঙ্গীতে ম্যানেজার আবার চীৎকার করে বলতে শুরু করেছেন।

'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, বন্য সিংহের খাঁচায় লিওনার্দোর একাকী প্রবেশ করাটা নাকি ধাপ্পাবাজী, ভদ্রলোক এই বলে পালিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু কথাটা একদম অস্বীকার করছি। এখন দর্শকদের মধ্যে কারো যদি এ সন্দেহ থেকে থাকে তিনি দয়া করে নেমে এসে ব্যাপারটা প্রমাণ করে যান। আর এও বলছি আমি আপনাদের, যদি ব্যাপারটা কেউ প্রমাণ করতে পারেন, বা কেউ যদি সাহস করে ঐ সিংহের খাঁচায় লিওনার্দোর সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আসতে পারেন তাহলে আমি তাঁকে এই সার্কাস কোম্পানীর তরফ থেকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেবো। অতএব নেমে আসুন, যার সাহস আছে এগিয়ে আসুন, পাঁচটা সোনার মুদ্রা পুরস্কার নিয়ে যান।' কথাটা শেষ করে একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেছেন তিনি, 'হ্যাঁ চলে আসুন, যে কেউ আসুন, ইংলণ্ডের সম্মান ও শৌর্যের পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ পাউণ্ডের পুরস্কার নিয়ে যান। যে কেউ হোক, পুরুষ নারী বা শিশু, চলে আসুন।'

পূর্ব নির্দেশ মত ম্যানেজারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ওরেলী।

'আমি যাবো, আমি কোনো বুড়ো সিংহকে ভয় পাইনে।' মুখস্থ-

কথা কথাটা চিৎকার করে বলতে কোনোই অসুবিধা হয়নি ওরেলীর। তাঁবু-ভর্তি সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি নিজের উপর উপলব্ধি করে ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করেছেন তিনি। তাঁকে সাহস দেবার জন্য দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠেছে

'বেশ বাছা, তোমার তো বেশ সাহস আছে দেখছি। তা তোমার বাবা কোথায়, তাঁর কাছ থেকে অনুমতিটা নিয়ে নেওয়া যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ওরেলীর পাশ থেকে পাকা অভিনেতা তার বাবা উঠে দাঁড়িয়ে গাঢ় গলায় বলে উঠলেন,

'আপনি ইংলণ্ডের সম্মান ও শৌর্যের পরীক্ষা দিতে মানুষ খুঁজছিলেন একটু আগে। তা আমার দেশের জন্য আমার একমাত্র পুত্রকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে আমার দ্বিধা নেই। আমার একমাত্র পুত্রের জীবনের চেয়েও আমার দেশের মান-সম্মানের প্রশ্ন সবচেয়ে আগে। আমি সানন্দে আমার পুত্রকে সম্মতি দিলাম' বৃদ্ধের কাঁপা কাঁপা আবেগ-বিহ্বল গলার স্বরে দর্শকের চোখ মুহূর্তেই সজল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের ভাড়া করা ব্যাণ্ডে বেজে উঠল 'রুল বিট্রানিয়া' সুর। মুহূর্তের মধ্যে সার্কাসের তাবুর ভেতর এক দেশত্ববোধের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে গেল সহজে তারপর ব্যাণ্ডের বাজনা যখন থামল; ম্যানেজারের গলাটা শোনা গেল আবার

'আপনার মত স্বদেশ প্রেমিককে আমি আমার অন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগন, আজকে রাত্রি অনেক হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক বেশী সময় ধবে আজকের খেলা দেখানো হয়ে গেছে। অতএব আমাদের মার্জনা করুন আপনারা। সময় থাকলে আজকেই আমরা ঐ স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধের একমাত্র পুত্রকে তাঁর অসমসাহসিক কাজে বাধা দিতাম না কিন্তু যেহেতু আর সময় নেই অতএব কালকের জন্য খেলাটা মুলতুবী রইল। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কালকে ঠিক রাত্রি নটার সময় ওই বীর বালক লিওনার্দোর সঙ্গে বন্য সিংহের খাঁচায় প্রবেশ করে তার বীরত্বের প্রমাণ দেবে।'

সেদিনের মত খেলা দেখানো শেষ হল। আর পরদিন ভোর থেকেই অভূতপূর্ব সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল ওরেলীর জীবনে। শহরের বিভিন্ন কাগজের প্রতিনিধিরা এসে ওরেলীর সঙ্গে দেখা করলেন, নানা ভঙ্গীতে ছবি তোলা হল তাঁর। আর শহর ভরে অসমসাহসী এক বীর বালকের নামে গুঞ্জন উঠল। রাতারাতি শহরময় বিখ্যাত হয়ে গেলেন ওরেলী। ১৮৯৭ সালের একটি দিনেই টাইগার ওরেলীর নাম ছড়িয়ে পড়ল দিকবিদিকে।

আর যতই রাত্রি এগিয়ে আসতে লাগল ততই ভীড় বাড়তে লাগল সার্কাসের টিকিট ঘরের সামনে। সমস্ত আসন ভর্তি হয়ে যেতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। চড়া দামের কয়েকটি বাড়তি আসনও দেওয়া হল সেদিন রাত্রির শোয়ে। সন্ধ্যে থেকেই ওরেলীকে নতুন পোশাকে সেজেগুজে সার্কাসের তাবুর বাইরে মালেকের সোনালী খাঁচার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হল। লোকের হৈ হট্টগোলের মধ্যে মুহুর্মুহু মালেকের প্রচণ্ড গর্জনে সমস্ত অঞ্চলটা গম গম করে উঠল।

অবশেষে ঘড়িতে রাত্রি নটার ঘণ্টা পড়ল। ম্যানেজার রিঙ-এর ভেতর মালেকের খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বৃটিশজাতির গুণগান করলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার হাত ধরে নতুন পোশাকে রিঙ-এর ভেতর ওরেলীকে প্রবেশ করতে হল। দর্শকদের ভেতর থেকে হাততালির ঝড় উঠল, ব্যাণ্ডে 'রুল ব্রিটানিয়া' বাজল, খাঁচার ভেতর থেকে প্রচণ্ড গলায় গর্জন করল মালেক। আর লিওনার্দো যখন ঝলমলে পোশাকে রিঙ-এর মধ্যে এসে ঢুকলেন, দর্শকরা হৈ হৈ করে উঠল। এক সময় যখন সমস্ত চীৎকার হৈ হট্টোগোল থামল, বৃদ্ধ কম্পিত নাটুকে গলায়, চীৎকার করে বলে উঠলেন,

'যাও পুত্র, দেশের সম্মান রক্ষার জন্য বীরের মত সিংহের খাঁচায় প্রবেশ কর।' স্তব্ধতার ভেতর বৃদ্ধের কম্পিত স্বর এক অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্টি করল। খাঁচার দুপাশে দুজন বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়াল, লিওনার্দো আস্তে আস্তে সরু পাটাতনটার উপর হেঁটে যেতে যেতে চাপা

স্বরে ওরেলীকে বললেন, 'আমার গায়ে গা লেগে দাঁড়িও, একটুও নড়াচড়া করো না। কোনো ভয় নেই।'

প্রথম দরজাটা খুলে খাঁচার ভেতর প্রবেশ করলেন লিওনার্দো, পাশে ওরেলী। ভেতরে পা দিয়ে এই প্রথম ওরেলীর শরীরটা যেন কেঁপে উঠল একবার। তার পলক না-পড়া চোখের উপর দিয়ে সে আস্তে খাঁচার ভেতরের দরজাটাও খুলে যেতে দেখল আর মুহূর্তেই যেন মালেককে সে তাদের চার পাশে দেখতে পেল। আর বিদ্যুৎ-এর মত মালেকের শরীর যখন তার পাশ ঘেঁষে সরে গেল ওরেলীর সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল। এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে সোনালী পিস্তল আর চাবুকটা নিয়ে লিওনার্দো মালেকের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড গর্জনে চীৎকার করে উঠে মালেক ওরেলীর দিকে ছুটে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে লিওনর্দোর পিস্তল ও চাবুক একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। অসম্ভব কয়েকটি বোধহীন মুহূর্তের পর ওরেলী লিওনার্দোর হাত ধরে যখন আবার খাঁচার বাইরে রিঙ-এর মাটিতে নেমে দাঁড়ালেন দর্শকরা তখন পাগলের মত চীৎকার করে উঠল, ওরেলীর নাম ধরে ডাকল, ঝড়ের মত হাততালি দিল। ম্যানেজারবাবু ছুটতে ছুটতে এসে সমস্ত দর্শকের সামনে পাঁচ পাউণ্ডের মুদ্রাগুলো বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও যেন কী হল তারাও পকেট উজাড় করে পয়সাকড়ি ছুঁড়ে দিতে লাগল ওরেলীকে লক্ষ্য করে। সেদিকে লক্ষ্য না করে ওরেলী তখনও তাকিয়ে ছিলেন মালেকের ঐ সোনালী খাঁচাটার দিকে। এক দৃষ্টে ঐ খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর কেবলই যেন মনে হচ্ছিল ওটা কোন খাঁচা নয় আসলে এক সোনালী মৃত্যুর গহ্বর ওটা।



# কলুষিত প্রেম

সে এক অবিশ্বাস্য প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের কাহিনী। একটি পুরুষের জীবনে দুই নারী। অথচ কলহ নয়, বরং এক উষ্ণ, অখণ্ড জীবনরচনা। দীর্ঘকাল সমাজের পরিচিত মানুষজনের অজ্ঞাতে তাঁদের এই মিলিত জীবন কেটেছিল।

যদিও ডিভনশিয়ারের পঞ্চম ডিউক, উইলিয়াম ক্যাভেনডিসের পরিবারটি দীর্ঘ চারশো বছর ধরে সমাজের ও রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় পরিবার হিসাবে বিখ্যাত ছিল। বিশেষত উইলিয়াম কেবলমাত্র সামাজিকভাবেই নয়, রাজনৈতিক কারণেও বিখ্যাত ছিলেন। বিবাহের দ্বারা তিনি সিসিলস্-এর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। (প্রধানমন্ত্রী হ্যরল্ড ম্যাকমিলন হলেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির তরফের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়)। তাঁর নিজের পরিবারেও উইলিয়ামের ছিল একটি বিশেষ আসন, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে বিপুল খ্যাতি ছিল তাঁর।

যখন উইলিয়াম পঁচিশ বছরের যুবক তখন তাঁর বিয়ে হয়েছিল আর্ল অফ স্পেনসারের কন্যা সতেরো বছরের কুমারী জর্জিয়ানার সঙ্গে। জর্জিয়ানা ছিলেন যেমন অপরূপ রূপবতী তেমনি তাঁর বুদ্ধি আর রসিকতার মেজাজটিও ছিল তীক্ষ্ণ। গেয়েনসবরো তাঁর যে ছবি এঁকেছিলেন, সেই অস্ট্রিচের পালক লাগানো টুপী পরা অবস্থায়, তা পরবর্তী কালে গেয়েনসবরো সিনেমা কোম্পানির ট্রেডমার্ক হয়ে গিয়েছিল।

এক আশ্চর্য উষ্ণ হৃদয় ছিল জর্জিয়ানার আর ছিল কাব্যিক মন। কিন্তু বিয়ের পর অন্তত কিছু দিনের জন্য স্বামীর আচরণ তাঁর কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। স্বামীর সমস্ত আচার-আচরণ অনুভূত তাঁর কাছে বরফ খণ্ডের মত মনে হয়েছিল। বড্ড বেশী ঠাণ্ডা, বড় বেশী মার্জিত। গম্ভীর মেজাজের উইলিয়ামের ব্যবহারিক আচার-আচরণের গভীরে সুপ্তভাবে যে গোপন স্রোত ছিল তার স্পর্শ দীর্ঘকাল জর্জিয়ানার কাছে ছিল অজ্ঞাত হয়ত আনন্দের আতিশয্যে জর্জিয়ানা গিয়ে স্বামীর কোলের উপর বসে, দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই উইলিয়াম তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তাঁকে কোল থেকে ঠেলে মেঝেয় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এই ধরনের কঠিন আচরণে জর্জিয়ানা মনে মনে ব্যথা পেতেন, কিন্তু ক্রমশ তা গা সওয়া হয়ে এলো সব এবং তিনি তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেজাজের জন্য সামাজিক আসরে গৃহকর্ত্রীদের পুরোধা হয়ে উঠলেন

রাতের পর রাত ডিভনশিয়ারের প্রাসাদে উজ্জ্বল সব আসর বসতো আর জর্জিয়ানা সেই-সব আসরের মধ্যমণি হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর চারিপাশে তখন ভিড় করে থাকত প্রিন্স অফ ওয়েলস্, চার্লস জেমস্ ফক্স, ডাঃ জনসন, নাট্যকার সেরিডন, ওয়াল-পোলের মত সব বিখ্যাত ব্যক্তিরা। ডিউকও সেই সব আসরে যোগ দিতেন কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে সেই আনন্দের উষ্ণতা খুঁজে পাওয়া যেতো না। বরং এক দাম্ভিক মেজাজী শীতলতা ফুটে থাকত সব

সময়। জর্জিয়ানা স্বামীর ব্যবহারে বিরক্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতেন না।

এদিকে উইলিয়াম জীবনযাপন করতেন একজন যুবরাজের মত। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর দশটা প্রাসাদ ছিল, চাটস্‌ওযাবর্থ্ বা সেই একশ জানলার হার্ডউইকের টিউডোর ম্যানসানও তাঁর ছিল ছ'বছরের বিবাহিত জীবনেও তাঁদের কোনো সন্তান হয় নি যদিও ডিউকের পূর্বের এক জারজ কন্যা ছিল, জর্জিয়ানা সেই বাচ্চাটিকেই আপন সন্তানের মত লালন-পালন করতেন। উইলিয়ামের সঙ্গে বাচ্চাটির আশ্চর্য চেহারার মিল ছিল বলে তার নাম রাখা হয়েছিল চার্লটি উইলিয়ম।

ঠিক এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই দ্বিতীয় রমণীটির আবির্ভাব ঘটেছিল ডিভনশিয়ারের প্রাসাদে।

আর্ল অফ ব্রিস্টলের কন্যা এলিজাবেথ ফস্টার ছিল ভদ্রমহিলার নাম। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন আইরিশ জমিদার জন ফস্টারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েই এলিজাবেথ তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে।

জর্জিয়ানা তাঁর এই বান্ধবীটির দুঃখে পীড়িত হয়ে তাঁকে গ্রীষ্মের দিনগুলো তাঁদের প্রাসাদে এসে কাটিয়ে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। জর্জিয়ানার তখন পঁচিশ চলছে আর বান্ধবী এলিজাবেথ যাকে তিনি 'বেস' বলে ডাকতেন তিনি জর্জিয়ানার থেকে পাঁচ মাসের ছোটো অর্থাৎ তাঁর তখন চব্বিশ বছর সাত মাস। পরস্পরের চেহারারও যথেস্ট অমিল ছিল তাঁদের, বিচিত্র সব বাঁক নেওয়া শরীর জর্জিয়ানার, তোলা নাক, হাস্যোজ্জ্বল ঠোঁট আর অগোছাল চুলের বোঝা পিঠময়। অন্যদিকে বেস যদিও রূপসী তবু তাঁর সৌন্দর্য ছিল ভিন্ন ধরনের। রোগা চাপা সরু ছাঁদের মুখ, টানা চোখ, কমনীয় শরীর আর ক্ষীণ অথচ উত্তেজক হাসি ঠোঁটে। স্বভাবের দিক থেকে

জর্জিয়ানা চপল, সহৃদয়, হাসিখুশি আর এলিজাবেথ চাপা, সতর্ক, সংযত চালচলন।

জর্জিয়ানার সংসারে এলিজাবেথের প্রবেশ ঘটল একজন দুঃস্থ, দুর্বল মহিলা রূপে, নির্দয় স্বামীর হাতে মার খাওয়া একজন হতভাগ্যের মতন। ডিভনশিয়ারের প্রাসাদে তাঁর পা দেওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই এলিজাবেথ পরম রূপসী বন্ধু হয়ে উঠলেন ডিউক ও জর্জিয়ানার, একান্ত আপনজন, তাঁরা তাকে 'অ্যানজেল, বলে ডাকতে শুরু করলেন।

তিনটি জীবন তারপর ক্রমশ সংলগ্ন হতে হতে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেল। তাঁরা পরস্পরকে আদরের ডাকনামে ডাকতেন। ডিউকের আদরের নাম হল 'ক্যানিস্' জর্জিয়ানার 'র‍্যাট' আর এলিজাবেথের হল 'র‍্যাকি।'

আর অন্যদিকে একান্ত গোপনে এলিজাবেথের সঙ্গে ডিউকের এক উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল। কিছু দিনের মধ্যে জর্জিয়ানাও ব্যাপারটা টের পেলেন, অথচ কোনো সংঘাত উপস্থিত হল না তাঁদের জীবনে বরং দেখা গেল, দুজন রমণী কেবলমাত্র একজন পুরুষকেই অধিকার করে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। চিঠিতে জর্জিয়ানা একবার 'বেস'কে লিখলেন :

'আমার সমস্ত বন্ধুত্ব বা সখিত্বের ধ্যান-ধারণা তোমার মধ্যেই দানা বেঁধে আছে। তোমাকে ছাড়া পৃথিবী আমার কাছে মূল্যহীন। তুমি যদি কখনও আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি সে বিচ্ছেদ কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, জেনো আমি আর বাঁচব না তাহলে।'

এই সময় দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটিয়ে হঠাৎ জর্জিয়ানা গর্ভবতী হলেন। আশ্চর্য এই ঘটনার জন্যও তিনি বেসকেই ধন্যবাদ জানালেন। কী যে বুঝেছিলেন জর্জিয়ানা! হয়ত তাঁর ধারণা হয়েছিল, এলিজাবেথের উপস্থিতি তাঁর স্বামীর শীতল স্বভাবে উষ্ণতার সঞ্চার ঘটিয়েছে, ফলেই তাঁর এই মাতৃত্বের সূচনা।

হয়ত জর্জিয়ানার ব্যাখ্যাটাই ঠিক ছিল। কারণ একথা ঠিক, এলিজাবেথের চাপা ওষ্ঠের ক্ষীণ অথচ উত্তেজক হাসিই ডিউককে চঞ্চল করে তুলেছিল আর আশ্চর্য প্রথমবার জননী হয়েই জর্জিয়ানা আরো উদার, আরো সহৃদয় হয়ে উঠেছিলেন। সব সময় তাঁর বাচ্চাকে 'আমাদের তিনজনের' বলে উল্লেখ করতেন। জর্জিয়ানার প্রসবের সময় 'বেস' ডিউকের জারজ কন্যা চার্লটিকে নিয়ে ডিউকের খরচায় ফ্রান্সে বেড়াচ্ছিলেন। জর্জিয়ানা তাঁর বান্ধবীকে চিঠি লিখে-ছিলেন তাঁর প্রসবকালীন সেই উত্তেজক মুহূর্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে। তাঁর ভাষায়:

'অশান্ত ছট্‌ফটে পায়ে ক্যানিস্ দরজার কাছে ঘুয়ে বেড়াচ্ছিল, ঘরে ডাচেস্ অফ পোর্টল্যাণ্ড বিছানার উপর ঝুঁকে বসেছিলেন এবং আমার বেদনার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চীৎকার করে উঠছিলেন, মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর ছুটে এটা-ওটা নিয়ে আসছিলেন, আবার কখনও উইলিয়ামের কাছে সরে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ওষুধের বিষয় আলোচনা করছিলেন।'

উত্তরে বেস লিখে পাঠালেন; "আমার বাচ্চাকে আমার হয়ে একটা চুমু দিও, ক্যানিস বলেছে আমাকে ওর ছোটো মা হতে।"

তারপর দু' বছরের মধ্যেই তিনজনের মিলিত জীবনে একটা ঝড় উঠল। এইবার বেস গর্ভবতী হলেন ও জর্জিয়ানাকে ঘটনাটা না জানতে দিয়ে ইটালিতে পালিয়ে গেলেন তিনি সেখান থেকে এলিজাবেথ ডিউককে লিখে পাঠালেন, সমাজের ঐ কুৎসিত গুজবে তাদের মিষ্টি জর্জিয়ানা যাতে না বিচলিত বোধ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে।

ডিউক উত্তরে লিখলেন, এলিজাবেথের কোনো ভয় নেই, ঘটনাটা জর্জিয়ানা খুব শান্তভাবেই মেনে নিয়েছে।

এই সময় জর্জিয়ানাও আবার গর্ভবতী হয়েছিলেন, অতএব এক বছরেই ডিভনশিয়ারের পঞ্চম ডিউক দু'কন্যার জনক হলেন।

এলিজাবেথের মেয়ের নাম রাখা হল ক্যারোলাইন আর জর্জিয়ানার হ্যরিয়েট।

'পরের বছর আবার বেস বাইরে গেলেন একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে এবং তার চার বছর পরে জর্জিয়ানাও প্যারিসে একটি পুত্র সন্তান ও সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম দিলেন।

'এমন একটি আনন্দিত জন্ম ইতিপূর্বে এই পরিবারে আর ঘটেনি', বলল বেসের সহচরী এ্যনা স্কার্ক। ডিউকের প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করে উঠল, বিশাল ভোজসভা বসল বাগানে। সেই সন্ধ্যায় বেস অপেরা দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে জর্জিয়ানার প্রসব বেদনার সংবাদ শুনে ছুটে গেলেন তাঁর ঘরে ঘরে তখন অনেক মানুষ জড় হয়েছে, জর্জিয়ানার মা এসেছেন, দাই ডাক্তার রিচার্ড ক্রেস্ট এ্যনা স্কার্ক, জর্জিয়ানার দুজন অনুরক্ত দাসী, দরজার কাছে ডিউক।

ডিভনশিয়ারের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্মের সংবাদ যথাসময়ে ইংলণ্ডে এসে পৌছল 'চ্যটস্‌ওয়ার্থের এত সব বড় বড় ডাক্তার থাকতে ওই তিরিশ বছরের একটা ছোকরা ডাক্তারের হাতে প্রসব হল কেন? আর প্যারিসেই বা কী জন্যে?' উচ্চতলের সামাজিক আসরে গুঞ্জন উঠল এবং চাপা ঐ গুঞ্জন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ফলত তাদের তিনজনের সেই মিলিত অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকেও অনেকের দৃষ্টি পড়ল সেই সময়ে। অনেকে আবার এ সন্দেহও পোষণ করলেন যে পুত্রসন্তানটি আসলে জর্জিয়ানার নয়, এলিজাবেথের সন্তান।

তাঁরা তিনজনে কিন্তু সমাজের এই কুৎসিত আলোচনা গায়ে মাখলেন না। বরং পাঁচটি সন্তান নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটল তারপর। দীর্ঘ কালীন স্বামীর প্রতি অনুরক্ত জীবন কাটিয়ে হঠাৎ নিজের থেকে সাতবছরের ছোটো,

একজন বড় ঘরের যুবক, চার্লস গ্রের প্রেমে পড়লেন জর্জিয়ানা। তাঁর সেই উন্মত্ত প্রেম এমন কি শীতল মেজাজের ডিউককে পর্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করে তুলল। কিন্তু কোনো ফল হল না তাতে, পুত্রসন্তান জন্মের দু'বছর পর জর্জিয়ানা এ্যাসেক্সে একটি কন্যার জন্ম দিলেন। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার দেখা গেল কন্যাটিকে জর্জিয়ানা কোনো অবস্থাতেই ডিউকের কন্যা বলে সমাজে চালানোর চেষ্টা করলেন না। মেয়েটির নাম রাখা হল এলিজা কার্টিন এবং হার্ডউইকে গ্রের প্রাসাদে কন্যাটি বড় হতে লাগল।

বেশ কয়েকটি সন্তান তখন তাঁদের। এবং এ ছাড়াও বেসের প্রথম স্বামীর দুটি পুত্র সন্তান এই সময় জন টমাস ফস্টার মারা গেলে এলিজাবেথ দুটি পুত্র সন্তান নিয়ে আইনত বিধবা হলেন। তখন তাঁর পুত্র সন্তানদের বয়স যথাক্রমে উনিশ আর ষোলো। তারা যখন তাদের মার সঙ্গে ডিভনশিয়ারের প্রাসাদে দেখা করতে এলো তখন জর্জিয়ানাই তাদের সাগ্রহে অভ্যাগনা করলেন। 'তারা এলো ভোর ছটার সময়, কী করুণ সেই দৃশ্য বাচ্চারা তাদের মা বেসকে জড়িয়ে ধরল, ওদের মা-ও আনন্দে কেঁদে উঠল। ফেড্রিক তো বেশ লম্বা চওড়া একজন জোয়ান পুরুষ মানুষের মত, আগস্টাস একটা মেয়ের মত, স্বপ্নময় চোখ, কোঁকড়ানো চুল।' জর্জিয়ানা দৃশ্যটির বর্ণনা করে তাঁর একটা চিঠিতে লিখেছিলেন।

বিচিত্র আশ্চর্য এক সম্পর্ক, হাসিখুশি মেজাজের জীবন কাটিয়ে তারপর জর্জিয়ানা মারা গেলেন আটচল্লিশ বছর বয়সে।

'আমার অস্তিত্বের একটা বড় অংশই ছিল জর্জিয়ানা, ওকে ছাড়া আমি কী করে বাঁচব?....আমি দেখলাম ওর কফিন বয়ে নিয়ে চলে গেল, গম্ভীর গলায় আমি মন্ত্রোচ্চারণ শুনলাম, তারপর বিশাল শোভা-যাত্রা ডিভনশিয়ারের প্রাসাদ পরিভ্রমণ করে চলে গেল।' নিজের ব্যাক্তিগত ডাইরীতে লিখেছিলেন বেস।

জর্জিয়ানার মৃত্যুর তিন বছর বাদে ডিউক বেসকে আইনসম্মত-

ভাবে বিবাহ করলেন এবং বাষট্টি বছর বয়সে বুকে জল জমে মারা গেলেন তিনি।

ডিউকের মৃত্যুর পর ডাউএজার ডাচেস্ অফ ডিভনশিয়ার ইংলণ্ড থেকে রোমে চলে গেলেন। সেখানে সমাজের ও বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যমণি হয়ে কাটালেন কিছু দিন। একজন কার্ডিনালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল সেই সময়। তারপর পোপের জন্য মার্বেল পাথরের মূর্তি ও নিজেব ফোরাম তৈরি করালেন তিনি নিজেব খরচায়।

বয়স যখন তার ছেষট্টি বছব পূর্ণ হল মাবা গেলেন তিনি। এবং এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য জীবনযাত্রারও অবসান ঘটল। মৃত্যুতেও তিনি লোকেব চোখে এক বিস্ময় হয়ে থাকলেন। কারণ তাঁর মৃত্যুর তারিখটা ছিল ৩০শে মার্চ ঠিক আঠারো বছর আগে ওই দিনেই তাঁর প্রিয়তমা বান্ধবীটি মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু এলিজাবেথের মৃত্যুতেও সমাজের কুৎসিত আলোচনাটা থামল না এবং চিরকালেব জন্য ক্যাভেনডিস্ পরিবারের লোকের চোখে ডিভনশিয়ারের সত্যিকারের ডিউক যে কে এই প্রশ্ন ও সংশয় থেকে গেল।

# সানফ্রান্সিসকোতে ভূমিকম্প

তীব্র হুইসেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল ট্রেনটা। তারপর চলতে শুরু করল ঝড়ের বেগে। বেঞ্চিতে কোণার দিকে নিঝুম হয়ে বসে আছেন কার্লো। ফ্রেড সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শেষ বারের মত শহরটার দিকে তাকালেন একবার। এই ভোর বেলায় উজ্জ্বল রোদ পড়েছে শহরের উপর, ঝলমলে দেখাচ্ছে সবকিছু। অথচ ফ্রেড জানেন এই স্টেশনের এলাকাটা ছাড়িয়ে কয়েক পা হাঁটলেই চোখের দৃষ্টিটা চমকে উঠবে সকলের, ভয়ংকর সব দৃশ্য দেখার বিস্ময়ে মুখটা যাবে হাঁ হয়ে। বড় রাস্তার সেই ভয়ংকর ফাটলটা চোখে পড়লে তো কথাই নেই—আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে হবে। ভাঙাচোরা বাড়ি ঘরগুলোর কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল।

ট্রেনটা শেষ বারের মত চিৎকার করে বিদায় জানিয়ে শহরটাকে পেছনে ফেলে রেখে ছুটে চলল সামনের দিকে। শহরটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল ফ্রেড ততক্ষণ মুখ বাড়িয়ে রইলেন ট্রেনের জানালা

দিয়ে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন আয়েস করে। যাক অবশেষে মুক্তি পাওয়া গেল গত কয়েক দিনের ভয়াবহ অবস্থাটার হাত থেকে। যদিও এ কয়েক দিন কতগুলো উট্‌কো টাকা রোজগার হল তাঁদের। কয়েকটা মাস বেশ নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ানো যাবে। টাকা-পয়সার জন্য তেমন ভাবনা-চিন্তা করতে হবে না। তবু আকারণেই ওই দুর্দশাগ্রস্ত শহরটার কথা ভেবে চোখটা বাররার সজল হয়ে এল। মনে পড়ে যেতে লাগল সেই প্রথম দিন শহরে পা দেওয়ার অনুভূতি, সেই নরক সদৃশ চায়না টাউনের জুয়া খেলার আসর, তারপর সেই ভয়ংকর ভূমিকম্পের মুহূর্তটা, সপ্তাহ কয়েকের সেবাকার্যের সময় দেখে কয়েকটি অমানুষিক দৃশ্য। এই মুহূর্তে এক এক করে সব মনে পড়ে যেতে লাগল ফ্রেডের। যেন ছায়াছবির মত মনের পর্দায় একে একে ভেসে উঠল তারা।

স্পষ্ট মনে আছে তার এলোমেলো কয়েক মাস উদ্দেশ্য হীনের মত ঘোরার পর প্রথম ওই শহরটায় পা দিয়েই কেমন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল মনটা, চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। ছবির মত সাজানো-গোছানো ঝকঝকে শহর। প্রথম দর্শনেই ভালোবাসায় বুকটা যেন ভরে ওঠে আকাশে তখন গোধুলি বেলার সোনার আলোটুকু লেগেছিল সমুদ্রের উপর, সেই আলো পড়ে তরল আভাময় এক রূপ নিয়েছিল। শহরের একটা ব্যাপার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তাঁর, দুচোখের বিষ ওই আকাশ ছোঁয়া স্কাই স্ক্রেপারগুলোর বাহুল্য নেই দেখে। তারপর কেয়ারনী স্ট্রিট আর কালিফোর্নিয়া স্ট্রীটের মোড়ের ছোট ছিমছাম হোটেলটি দেখেও ভালো লেগেছিল। তেমন হই হটগোল নেই, মানুষগুলোর নরম শান্ত চলাফেরা মৃদু গলায় কথা বলা যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল তাঁদের। আর কার্লো তো নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকেই ঘুমোনোর জন্য পোশাক পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছিল। ফ্রেডের কিন্তু এক মুহূর্ত তর সইছিল না আর অনেকের মুখে শোনা সানফ্রান্সিসকোর সেই কুখ্যাত চায়নটা টাউনা দেখে আসবার জন্য

ভেতরে ভেতরে সে কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করছিলেন ওই শহরে পা দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই। কার্লোর কোনো রকম ওজর-আপত্তি না শুনেই তাঁকে প্রায় একরকম জোর করেই তিনি হোটেলের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। আজ এতদিন বাদে সেই ছোট ঘটনার খুঁটিনাটিটা ভাবতে গিয়ে ফ্রেড মনে মনে শিউরে উঠলেন। ভাগ্যিস সেদিন তিনি জোর করেই কার্লোকে হোটেল থেকে বের করে এনেছিলেন নচেৎ আজ তো জীবিতই থাকতেন না তিনি। ভূমিকম্পের ধাক্কায় কোথায় কোন দেওয়াল চাপা পড়ে একেবারে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যেতেন কার্লো।

হোটেল থেকে বেরুতে তাঁদের সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে উঠেছিল রকমারি আলো, বিলাসী নারী-পুরুষের চলাচল সবে শুরু হয়েছিল, কাফে রেস্তোরাঁয় বেজে উঠেছিল নাচের বাজনা। কেয়ারনী স্ট্রীটের সমান্তরাল রাস্তা গ্র্যাণ্ট অ্যাভিনিউর আশে পাশে চায়না টাউনের কুখ্যাত অংশটা খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। বরং কাউকে জিজ্ঞেস না করেই হাঁটতে হাঁটতেই পেয়ে গিয়েছিলেন সেই ছায়া ছায়া আলো-আঁধারের রাস্তাগুলো। গ্র্যাণ্ট অ্যাভিনিউর সেই রহস্যময় গলিটাতে পা দেবার আগেই যদিও ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে লটকানো সরকারী ছাপানো নোটিসটা চোখে পড়েছিল তাঁদের। নোটিসটায় বলা ছিল বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিপদ-আপদের ঝুঁকি বা দায় দায়িত্ব নিজেদের, এ অঞ্চলে সরকার তাদের কোনো রকম সাহায্য করতেই অপারগ।

সরকারী নোটিসটা উপেক্ষা করে কয়েক পা হাঁটবার পরই কেমন যেন মনে হয়েছিল ফ্রেডের। সরু সরু অন্ধকার সব গলি, রহস্যময় লোকজন আর বিচিত্র গন্ধ। যেন দম আটকে আসে। এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত লাগছিল তাঁর। তারপর একটা সর্পিল গলির মুখে সবুজ আলোজ্বলা একটা রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকতে কেমন গা'টা ছমছম করে উঠেছিল। তবে এটা তাঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, এতক্ষণে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন।

আঁকাবাঁকা ঘোরান পথ পেরিয়ে তবে মাটির তলার ঘরে নামবার সিঁড়িটা পাওয়া গিয়েছিল। বিশাল টানা একটা চতুষ্কোণ ঘর, টিমটিম করে কয়েকটা আলো জ্বলছে, লম্বা লম্বা চণ্ডুর পাইপের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা। একটা ভারী পর্দার মত ঝুলছে যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা। প্রথম কয়েক মুহূর্ত দম আটকে এল তাঁদের, চোখের দৃষ্টিতে কিছুই ধরা গেল না। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করে উঠল। কিছু সময় পর আস্তে আস্তে সয়ে এল সব, চোখের দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হল। ফ্রেড দেখলেন ঘর ভর্তি লোক, শান্তভাবে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে, কেউ বা গোল বিশাল জুয়া খেলার টেবিল ঘিরে নীরবে খেলে যাচ্ছে, কেউ কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে নির্বিকার মুখে লম্বা পাইপগুলো টেনে ধোঁয়া ছাড়ছে। সকলেই নিজের নিজের কাজে এত বেশী মগ্ন যে, কেউ কারো দিকে ভুল করেও তাকাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুই একটা চাপা ফিস্‌ফিস্ গলা শোনা যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে গিয়ে রহস্যময় নীরবতা ফিরে আসছে ঘরে। এত নীরবে ও নিপুণভাবে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে যে প্রথম দর্শনে মনে হয় ঘরের মানুষগুলো বোধ হয় জীবন্ত নয়। ওই গম্ভীর সুপ্রাচীন আবহাওয়ার মধ্যে ফ্রেডের একবার ইচ্ছে হল জোরে চিৎকার করে উঠে মজা করতে। কিন্তু ততক্ষণে কার্লো পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা বিশাল জুয়ার টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন। অগত্যা ফ্রেডকেও গিয়ে তাঁর পাশে বসতে হল। বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের নকশা করা সব কাগজের চাকতি নিয়ে লোক-গুলো নীরবে খেলে যাচ্ছে। ছাদ থেকে ঝোলান বিশাল একটা কেরোসিন তেলের বাতির নরম হলুদ আলো পড়েছে টেবিলের উপর। খেলোয়াড়দের মুখগুলো অন্ধকারে আবছা মতন, মাঝে মাঝে কেউ ঝুঁকে পড়ে টেবিল থেকে একটা চাকতি টেনে নিচ্ছে, খুব অল্প সময়ের জন্য আলোর তলায় ঝলসে উঠছে তার, নির্বিকার মুখ, আবার মুহূর্তে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

'খেলাটা কী ?' চাপা স্বরে কার্লোকে একটা খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেড।

'ফ্যন্‌ট্যন্‌।' টেবিলের উপর চোখ রেখে উত্তর দিলেন কার্লো।

ফ্রেডের মনে পড়ল চীনাদের এই অতিপ্রিয় খেলাটার কথা সে বহুবার শুনেছে। কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখেনি। অতএব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেলাটাকে লক্ষ করতে লাগলেন তিনি। অদ্ভুত অবিশ্রান্ত পদ্ধতিতে কাগজের চাকতিগুলো ঘুরে যাচ্ছে, খেলোয়াড়দের হাতে হাতে। কোনো চাকতি হাতে কাউকে খুব পীড়িত দেখাচ্ছে, কোনো মুখ আবার ঝলসে উঠছে আনন্দে। স্থির নিবদ্ধ চোখের পাতাগুলো ঘন ঘন কাঁপছে। ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে থেকেও খেলার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলেন না ফ্রেড। এই সময় প্রচণ্ড খিদে পাওয়ায় খাবারের সন্ধানে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে হল তাঁদের।

ফিরে এসে দেখলেন ইতিমধ্যে দুজন আমেরিকান এসে পাশের টেবিলটা অধিকার করে বসেছে। পাশের টেবিলটার দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলেন ফ্রেড পোকার খেলা চলেছে সেখানে। অতএব সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে তাঁরা আবার ফান্‌ট্যন্‌ খেলায় মনোনিবেশ করলেন। ফ্রেডের কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল তখন, খেলাটাকে যে করেই হোক বুঝতে হবে।

কিন্তু এই সময় সেই ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ ঘরের অখণ্ড নীরবতাটাকে চুরমার করে দিয়ে পাশের টেবিলের একজন আমেরিকান ছোকরা লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে, তারপর বেল্টের খাপ খুলে বের করে আনল একটা চকচকে পিস্তল। ঘরের চারিপাশে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। চাপা গলার অনেক মানুষের মিলিত কণ্ঠ শোনা গেল। দুম্‌ করে একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দ উঠল। অন্ধকার থেকে চিৎকার করে উঠল একটা গলা। ছাদ থেকে ঝোলান কেরোসিন তেলের একটা বাতি গেল উল্টে। মেঝের উপর চেয়ার ঠেলার কর্কশ শব্দ হল, মুহূর্তে ঝলসে উঠল কয়েকজনের হাতে ছুরির

ফলা। আর শেষ আলোটাও যখন নিবে গেল ঘরের তখন মানুষের কোলাহল, ঘুষোঘুষির শব্দ, টেবিল চেয়ার উল্টে যাওয়ার শব্দ সবগুলো মিলে অন্ধকারের মধ্যে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিল ঘরটা। এতক্ষণ হতভম্ব হয়েছিলেন ফ্রেড। শেষ আলোটা নিবে যেতেই সম্বিৎ ফিরল তাঁর। কার্লোর একটা হাত শক্ত করে ধরে ঘরের দরজাটার দিকে এগুলেন। আর সেই হুড়োহুড়ি হট্টগোলের মধ্য থেকে দরজা খুঁজে পেতে ভীষণ অসুবিধা হল তাঁদের। তারপর লম্বা টানা করিডরটায় পা দিয়েই চমকে উঠতে হল। হিংস্র মুখে ছুরি হাতে একদল চীনা সদর দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা একপা বাড়াতেই দলটা চিৎকার করে উঠল অগত্যা সামনের দিকে না এগিয়ে পিছনের দিকে হটে গেলেন তাঁরা। আর দিশেহারার মত আঁকাবাঁকা করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কার্লো একটা দরজা আবিষ্কার করলেন। তারপর কোনো রকমে সেখানকার কাঠের ভাঙাচোরা দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে বাইরের রাস্তায় পা দিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ফ্রেড। পরিশ্রমে উত্তেজনায় তখনও হাঁফাচ্ছিলেন কার্লো।

কয়েক পা নিশ্চিন্তে হাঁটবার পর অন্ধকার গলিপথে দাঁড়িয়ে হঠাৎই যেন অনুভব করতে পারলেন ফ্রেড চারিপাশ কেমন থমথমে হয়ে আছে। বাতাসটা কেমন ভারী হয়ে যেন ঝুলে আছে শূন্যের ভেতর, সহজ স্বাভাবিক ভাবে বইছে না। আর একটা গুমোট। মাথার ভেতরটা হঠাৎই যেন কেমন করে উঠল, নিঃশ্বাসটা যেন বন্ধ হয়ে গেল, বুকের ভেতর তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করলেন ফ্রেড।

'ভীষণ খারাপ লাগছে শরীর। কেমন যেন লাগছে চারপাশ।' বুকে হাত ঘষতে ঘষতে মাঝরাস্তায় থেমে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে বললেন ফ্রেড।

'হ্যাঁ আমারও শরীরের ভেতর যেন কেমন লাগছে। কী রকম, ঠাণ্ডা, কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে দেখেছ।' কাশতে কাশতে বললেন কার্লো। 'চলো হোটেলে ফেরা যাক তাড়াতাড়ি।'

আর পা বাড়াতে গিয়েই একবার কেঁপে উঠল ফ্রেডের শরীর সেই অশুভ হওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘূর্ণির মত আলোড়ন উঠল পায়ের তলায় মাটিতে। সেই ধাক্কায় কোনো রকমে টলতে টলতে গিয়ে ফ্রেড রাস্তার পাশের একটা দেওয়াল আঁকড়ে ধরলেন দুহাতে। তারপর চারপাশ জুড়ে ভয়ংকর সব শব্দ হতে থাকল। চিৎকার, কান্নার শব্দ, দুপাশের বাড়ী থেকে পিল পিল করে মানুষ জন ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল রাস্তায়। মাটিটা তেমনি পায়ের তলায় নাগরদোলার মত দুলতে লাগল। হুড়মুড় করে পাশের একটা বড় বাড়ীকে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়তে দেখলেন তাঁরা, ধূলোয় ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। কোনো রকমে তাঁরা ছুটতে ছুটতে গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীটে এসে পৌঁছলেন। তখনও দুরন্ত বেগে কাঁপছে পায়ের তলার মাটিটা, তাসের বাড়ীর মত ঝাপটা লেগে ভেঙে যাচ্ছে, পথের দুপাশের মস্ত মস্ত বাড়ীগুলো। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না দেখে তাঁরা শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তা মার্কেট ষ্ট্রীটের দিকে যেতে গেলেন। ধূলো ধোঁয়ায় চারিপাশ অন্ধকার, রাস্তার আলোগুলো সব উল্টে পড়ে গেছে, মানুষজন দিশেহারার মত এদিক ওদিক ছুটছে, চতুর্দিক জুড়ে ভংকর সব শব্দ উঠছে আচমকা দৌড়তে দৌড়তে ফ্রেড একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। লালে লাল হয়ে গেছে আকাশ, যেন আগুন লেগেছে। প্রায় উলঙ্গ, রাতের পোষাক পরা মেয়েরা বাচ্চা কোলে আর্তনাদ করে ছুটছে, সকলের দৃষ্টি সমুদ্রের দিকের রাস্তায়। কোনো রকমে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে ছুটতে ছুটতে মার্কেট ষ্ট্রীটের মোড়ের মাথায় এসে পৌঁছলেন তাঁরা। ফ্রেড দেখলেন আস্তে আস্তে চিড় খেতে খেতে সামনের বড় রাস্তাটা ফেটে যাচ্ছে। আতঙ্কে ভয়ে ফ্রেড-এর পা আর চলল না, তিনি যেন মৃত্তিকায় প্রোথিত কোনো বৃক্ষের মত কার্লোর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তাঁদের চোখের সামনে দুভাগ হয়ে কেটে গেল রাস্তাটা, ফাটলটা বিশাল হয়ে যেন তাঁদের পাতাল

দেখাল, একটা দিশেহারা সৌখীন চার ঘোড়ার আরোহী পূর্ণ গাড়ী, একদল উন্মাদ অর্ধউলঙ্গ ভয়ার্ত মানুষ, মেয়েদের জামাকাপড়ের ক্রেতা-পূর্ণ আলোজ্বলা দোকান এক এক করে সেই ফাটল দিয়ে টুপ টুপ করে পাতালের দিকে নেমে যেতে দেখলেন তাঁরা। আর এক সময় পাগলের মত চিৎকার করে উঠে ফ্রেড দৌড়লেন, পিছনে পিছনে কার্লো। অন্ধের মত ছুটতে ছুটতে তাঁরা যখন এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন আর তাঁদের শরীরে এক ফোঁটাও শক্তি অবশিষ্ট নেই। কোনো রকমে বালিতে মুখ গুঁজে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

পরদিন ভোর বেলায় যখন জ্ঞান ফিরল ফ্রেডের তখন চারিপাশ শান্ত। হাওয়ায় স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে এসেছে। কার্লোর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে আনতে দুপুর হয়ে গেল। কোনো রকমে অসুস্থ দুর্বল শরীরে শহরের রাস্তায় পা দিয়ে তাঁদের দৃষ্টি চমকে উঠল, অর্ধপ্রোথিত মানুষ, দেওয়াল চাপা ছিন্ন মানুষের হাত, গড়িয়ে পড়া ল্যাম্প-পোষ্টের তলায় মৃত শিশুর মথর দেহ। ভাঙাচোরা বাড়ীঘর আর রাস্তার মাঝখান থেকে দুভাগ হওয়া সেই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী ফাটল। কয়েকটি বাড়ীতে তখনও আগুন নেভেনি, রাস্তায় রাস্তায় ছেঁড়া পোষাক, অর্ধ উন্মাদ মানুষজনের জটলা, এখানে-ওখানে গাদা করা বাক্স প্যাঁটরা, চেয়ার টেবিল, রাস্তাভরা কাচের টুকরো। কোনো রকমে সাবধানে পা ফেলে ফেলে হোটেলটার কাছে গিয়ে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটাই দেখা গেল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে একটা ইঁটের বোঝার মত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হোটেল বাড়ীটা। ১৯০৬ সালের এপ্রিলের সেই ভয়ংকর সকালটা চিরদিনের মত মনে থাকবে ফ্রেডের। প্রকৃতির হিংস্রতার কাছে মানবগোষ্ঠীর অসহায়তার শ্রেষ্ঠতম দলিল হিসাবে দিনটা মুদ্রিত হয়ে রইল ফ্রেডের মনের পৃষ্ঠায়।

তারপর কয়েকটা সপ্তাহ ফ্রেড আর কার্লোর কোনো অবসর

থাকল না। বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও টাউন হলের কর্মীদের লম্বা কিউতে দাঁড়াতে হল তাঁদের। দুপুর থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল। বড় বড় সব তাঁবু খাটানো হল ময়দানে, শুশ্রূষা-শিবির খোলা হল। চলতে লাগল উদ্ধারকার্য। অভিজাত পাড়া নিউ হিল থেকে সমস্ত মোটর গাড়ীগুলো নিয়ে আসা হল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোট ছোট হাসপাতাল, সরকারী দপ্তর, বিনাপয়সার ক্যান্টিন খোলা হল। ফ্রেড আর কার্লোকে দেওয়া হল পুলিশের কাজ। বড় বড় ব্যাঙ্কের ভেঙে পড়া ঘরগুলো পাহারা দেওয়ার ডিউটি পড়ল তাঁদের। শহরের এই দুর্দিনের সুযোগে চোর ডাকাতের দলের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি লুট করে নেওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। সন্দেহ জনক কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপকর্ম করতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলবার অধিকার দেওয়া হল ঐ স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ দলকে। মানুষের অসহায়তা দুর্দশা দেখে দেখে তখন মনে হয়েছিল সরকারের এটা বাড়াবাড়ী। এই দুর্দশার সময় কে আর টাকা পয়সা চুরি করতে আসবে। কিন্তু তার এই ভুল ধারণাটা ভেঙে গিয়েছিল একদিন রাত্রে!

ট্রেনের কামরায় বসে সেই রাত্রের ঘটনাটা মনে করতে ভীষণ খারাপ লাগছিল ফ্রেডের। কিন্তু ঘটনার খুঁটিনাটি সুদ্ধ সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁরা একটা বড় ব্যাঙ্ক পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। সবে তখন সন্ধ্যা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় তখন টিম্‌টিম্‌ করে আলো জ্বলে উঠছে, শহরের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাটাও ফিরে আসছে একটু একটু করে। হাঁটতে হাঁটতে পাহারা দিচ্ছিলেন ফ্রেড। হঠাৎ চোখে পড়ল তাঁর, একজন শক্তসমর্থ চেহারার লোক মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা বাড়ীর স্তূপ হাতড়াচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ফ্রেড গিয়ে তার পিছনে দাঁড়ালেন। লোকটা এক মনে তার কাজ করে যাচ্ছিল বলে ফ্রেডের পায়ের শব্দ কানে যায়নি তার। লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে পিছন

থেকে উঁকি মারলেন তিনি আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। বাড়ি চাপা পড়া যুবতী একটা মেয়ের হীমশীতল শরীর পড়ে আছে মাটিতে, লোকটা ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিব ডান হাতের আঙ্গুলটায় আটকে থাকা একটা দামী পাথর বসানো আংটি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। গা'টা গুলিয়ে উঠলেও ফ্রেড সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগলেন লোকটার কার্য্যকলাপ। পচা গলা একটা গন্ধ আসছে মেয়েটার মৃত শরীর থেকে, খালি হাতে বিফল হয়ে লোকটা কোমর থেকে একটা ধারাল ছুরি বের করল এক সময়, তাবপর একটা হাতে মেয়েটির একটি স্তন চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে মেয়েটিব আঙ্গুলে ছুরিটা বসিয়ে দিয়ে আঙ্গুলটা নিপুন ভাবে কাটতে লাগল। এই দৃশ্যের পর নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না ফ্রেড। কোমর থেকে বিভলবাবটা টেনে বের করে নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকাব উঠলেন তিনি। চকিতে মুখ ফেরাল লোকটা, তারপর ছুবিটা হাতের মুঠোয শক্ত কবে চেপে ধরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করলেন না ফ্রেড, পর পর মানুষটার মাথা লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লেন বার কতক আর একটা ভারী শব্দ কবে মানুষটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এরপর থেকে বেশ কয়েকবারই ফ্রেডদের দলেব সঙ্গে শহরের গুণ্ডা, চোর ডাকাতের দলের গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি, হাতাহাতি হল। কয়েকবার মেয়েদের মৃতদেহের উপর যৌন-ব্যভিচারের জন্য কয়েক-জনকে সম্পূর্ণ মানবিক কারণেই হত্যা করতে হল ফ্রেডাকে।

মাস দুয়েক কাটানোর পর ফ্রেড আর কার্লো পুলিশ দল ছেড়ে সাধারণ শ্রমিকদের দলে মোটা মাইনের কাজ করলেন মাস খানেক। যদিও সরকারি অনুমতি ব্যতীত শহর ত্যাগের অধিকার ছিল না কারো তবুও শহরের অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয়ে এলো, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয়ে এলো, ক্যাম্পের অধিবাসীদের সরকারী বাড়ীগুলোয় জায়গা করে দেওয়া হল তখন ফ্রেড আর কার্লো শহর ছেড়ে যাবার জন্য দরখাস্ত করলেন।

খুব অল্প দিনের মধ্যেই সরকারী অনুমতি এসে গেল তাঁদের। আর তিন মাসের জীবন পাত করা সানফ্রান্সিসকো শহরটার কাছে বিদায় নিয়ে ফ্রেড ও কার্লো ট্রেনে উঠে বসলেন। আবার উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় ভেসে চললেন তাঁরা নতুন কোনো শহরের দিকে, নতুনতর কোনো বিপর্যয় বা উপলব্ধির দিকে।

তীব্র হুইসেল বাজিয়ে ট্রেনটা চলতে শুরু করল।



# নারী গুপ্তচর

কীর্তিস্তম্ভ গড়ে দেবে না কেউ তাঁদের জন্য। অনেকেব নামও থেকে যাবে অজ্ঞাত তবু তাঁরা যুদ্ধ বা শান্তি সকল অবস্থাতেই তাঁদের কাজ করে যাবেন। তাঁদের সাহস, বুদ্ধি আব চাতুর্য্যেব জন্য কত দেশ কত সব নিদারুণ পরিস্থিতির হাত থেকে বেঁচে গেছে, শত্রুর ধ্বংসাত্মক কার্যের খবব পূর্বাহ্নে পেয়ে সতর্ক হয়েছে। গোপনে তাঁবা কাজ করে গেছেন, মুখ বুজে অত্যাচার সয়েছেন, অপমান লাঞ্ছনা গায়ে মাখেন নি। তাঁদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনের হয়ত দেশের গৌবব চিহ্নের অধিকারী হওয়ার ভাগ্য হয়েছে। তবু তাঁদেব বেশীর ভাগের নাম কেউ কখনো জানবে না, কেউ জানবে না সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক হাজার সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেনস্ এজেনসি বা অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সারভিসের মহিলা গুপ্তচরদের কাহিনী। এঁরা শুধু আমেরিকারই গুপ্তচর।

অথচ সেই সব মহিলাদেরই দলে আছেন ডরথি হাটসান্, উঁচু

পকেট, ক্যাস্টেলবারো কিংবা সেই বিখ্যাত মহিলা লেখিকা যাঁদের অসমসাহসিক কার্যাবলী যে কোনো ব্যক্তিরই মনে ভয়, রোমাঞ্চ বা শ্রদ্ধা জাগাতে সক্ষম হবে।

যেমন ধরা যাক ডরথি হাটসানের কাহিনী। নিজে ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। তাঁর স্বামী ছিলেন লিগ অব নেশনস্-এর উঁচু পদের একজন অফিসার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর কিন্তু তাঁর ছিপছিপে শরীর, কোমল মুখশ্রীর জন্য তাঁকে দেখাত তিরিশ বছরের যুবতীর মত। স্বল্প পরিচিতরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইত না যে তাঁর তিনটি নাতি নাতনী আছে। কয়েকটি ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন, প্রচুর বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল আর গুপ্তচরদের প্রধানতম গুণ, ধৈর্য ছিল তাঁর অসীম। কোনো অবস্থাতেই বিচলিত বোধ করতেন না তিনি।

১৯৪৩ সালের একদিন ক্রয়ডন এয়ার পোর্টে, ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেনস্-এর এক কর্মকর্তা লক্ষ করলেন একজন লোক নিউ ইয়র্কগামী একটি প্লেনের এক যাত্রীর হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিল। চিঠিটা হয়ত সাধারণ ছিল কিন্তু কর্মকর্তাটি স্থির থাকতে পারেলন না। তাড়াতাড়ি নিউ ইয়র্কে খবর পাঠিয়ে দিলেন তিনি। লা গুয়ার্দা বিমানবন্দরে সেই যাত্রীটি নামলে তাকে লক্ষ করা হল এবং খুব সহজেই জানা গেল যাত্রীটি ম্যান্‌হাটনের একটা পুরনো বাড়ির বাসিন্দা।

এইবার ডরথি হাটসানের ডাক পড়ল ও. এস. এস-এর অফিসে। প্রধান অধিকর্তা ফ্র্যাঙ্ক বিলেস্কি তাঁকে বললেন :

'লোকটা হয়ত বাজে কিংবা হয়ত একজন শাঁসাল ব্যক্তি, তবু যা হোক লোকটার সত্যিকারের পরিচয় জানতে হবে।'

সেই মুহূর্ত থেকেই ডরথি কাজে লেগে গেলেন এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই জেনে ফেললেন দুজন বিদেশীর সঙ্গে লোকটা ওই পুরনো বাড়ির একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে ; ওই বাড়িটার দোতলায় একটা

বাচ্চাদের স্কুল আছে, আর সেই ছোট ঘরটার ঠিক পাশের ঘরটাও খালি পড়ে আছে অনেকদিন। অতএব ডরথি গিয়ে সোজা হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে বললেন: যুদ্ধে তাঁর স্বামী মারা গেছেন, তিনি এখন সহায় সম্বলহীনা, অতএব ইস্কুলে তাঁকে ফরাসী শেখানোর মাস্টারিটা দিলে তিনি বেঁচে যান। নিপুণা অভিনেত্রীর মত তিনি তাঁর শোক ও দুস্থতার চিত্রটা এমনভাবে হেডমিস্ট্রেসের কাছে ফুটিয়ে তুললেন যে, ইস্কুলের চাকরিটা পেতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হল না। আর ঘরটাও ভাড়া পাওয়া গেল খুব অল্প টাকায়।

তারপর কয়েকদিন ডরথিকে বসবার ঘরে অলসভাবে বসে থাকতে দেখা গেল। পাশের ঘরের বাসিন্দারা যখন তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতো তখন যেন কেমন চঞ্চল দেখাত তাঁর বসবার ভঙ্গীটা। যেন মনে হত তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনটা বড় দুর্বিসহ, তিনি যেন নতুন সঙ্গীসাথীর জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন।

দিনদশেক পরে তাঁর উন্মুখ ভঙ্গীর ফল ফলল। পাশের ঘরের একজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে বড় সিঃসঙ্গ বোধ হয়, অতএব আসুন না আজ দুপুরে আমাদের ঘরে এককাপ চা খাবেন আর গল্প গুজবও করা যাবে। তাতে আপনার নিঃসঙ্গতাটাও কাটবে হয়ত।'

উত্তরে ডরথি তাঁর সুন্দর মুখের লাজুক চোখের পাতা কাঁপিয়ে বললেন:

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আজ আমি বড় ব্যস্ত, অতএব····।'

এর কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ডরথিকে দেখা গেল পাশের ঘরের অন্য একজন বিশেষ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসতে, শরীরে চঞ্চল ভঙ্গী ফোটাতে। আর অবশেষে তিনদিনের মাথায় সেই বিশেষ ব্যক্তিটিও এসে ডরথির সামনে দাঁড়াল, তাকে নিমন্ত্রণ জানাল ঘরে এসে

চা খেয়ে যাবার জন্য। এইবারে ডরথি সম্মতি জানালেন, কিন্তু একটা শর্তে, তিনি যখন ঘরে চা খেতে যাবেন তখন ঘরে অন্য কেউ থাকবে না। লোকটি রাজী হয়ে গেল। আর দু সপ্তাহের মধ্যেই ডরথি এসে দেখা করলেন বিলেস্কির সঙ্গে এবং তাঁর সমস্ত সংবাদ জানালেন। তিনি জানালেন: 'ঐ তিনজন লোক পোলিশ রিফিউজী, তাঁদের কাজ আমেরিকা ও তার সঙ্গী দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ, আমেরিকায় তাঁদের প্রচুর সংখ্যক খবর আদান প্রদান করার সঙ্গী আছে। তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য সৈন্যদের চলাফেরার ও নতুন অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক খবর সংগ্রহ। তাঁরা বিশেষভাবে নর্ডনের গোলাবারুদের কারখানাটার ব্যাপারে উৎসাহী। তাঁদের সমস্ত সংগৃহীত খবর আর্জেনটিনা হয়ে জার্মানীতে যায়।'

ডরথি হাটসানের সংবাদের উপর ভিত্তি করেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশাল এক গুপ্তচর বাহিনীকে ধরে ফেলা হল। যুদ্ধের শেষের দিকে ঐ গুপ্তচরের চাকরি থেকে অবসর নিলেন ডরথি আর দু বছরের মধ্যেই মারা গেলেন।

অসমসাহসিক কার্যকলাপের জন্য গত যুদ্ধে যার নাম সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে সেই মহিলার বাড়ি 'দুরন্ত পশ্চিমে' আর তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'উঁচু পকেট।' নামটি সম্ভবত এসেছিল বন্য কাউবয়দের উঁচু পকেটওয়ালা পোশাক থেকে। ভদ্রমহিলার স্বামীকে জাপানীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, ফলে সেই মহিলাটির জীবনে কেবলমাত্র জাপানী সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা ছিল না। তিন বছর ধরে তিনি কেবল ফিলিপাইনে জাপানী সৈন্যের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করে সোজাসুজি জেনারেল ম্যাকারথিকে জানিয়ে দিতেন। অবসর সময় 'মৃত্যু শিবিরে' ক্ষুধার্ত আমেরিকান বন্দীদের জন্য তিনি খাদ্য চালান দেওয়ার কাজ করতেন। এইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য তিনি নিজেকে পণ্য রমণীদের শ্রেণীতে পর্যন্ত নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গত যুদ্ধে যে ক'জন গুপ্তচর ধরা পড়েছিল 'উঁচু পকেট'

ছিলেন তাদের অন্যতম। বিচারে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। জাপানী সৈন্যরা তাঁর হাত ও পায়ের নখ এক এক করে তুলে নিয়েছিল। এইভাবে তারা তাকে কথা বলতে বাধ্য করেছিল এবং যখন জাপানী প্রথায় বিশেষ জলচিকিৎসাও শেষ হয়েছিল তখন তাঁকে তারা ফেলে রেখে দিয়েছিল একটা গভীর বনের মধ্যে।

কিন্তু আশ্চর্য, এততেও 'উঁচু পকেট' বেঁচে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আবটুরো টস্কানিনির বিবাহিতা কন্যা ওযেলি ক্যাস্‌টেলবাবো অফিস অব স্ট্র্যাটজিক সরারভিসের হয়ে কাজ করতেন একদা তিনি ইটালীর গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির হয়েও কাজ করেছিলেন। অতএব পূর্বের অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে লেগে'ছিল। বিভিন্ন সব অঞ্চলে তাঁকে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াতে হত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে দলের লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে হত। আর এই সব কাজেব জন্য তাঁকে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হত। একবার এইভাবে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের প্রান্তে এসে পৌছেছিলেন। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছিল, গোধূলির আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, গেস্টাপো রক্ষীবাহিনী এসে তাঁকে ধরল।

'এই সময় এক মেয়েছেলে তুমি, কী করছ এখানে?'

'আর বল কেন, আমার স্বামীটা বেহেড মাতাল, ওর জন্য সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরতে আমার ভয় করে, আমার এক বোন কাছেই থাকে, আমি তার বাড়ীতে রাত কাটাতে যাচ্ছি।'

নির্ভুল ইতালীয় ভাষায় তিনি বোঝাতে লাগলেন রক্ষীদের। কিন্তু তারা ওর ভাষা বুঝতে না পারায় তিনি আবার ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় কথাগুলো বললেন। কি যে বুঝল রক্ষীরা তারাই জানে, ক্যাস্‌টেলবারোব সেই কম দামী স্যুটকেস হাতে করে বয়ে নিয়ে তারা তাঁকে পার করে দিল সীমান্ত। এই ভাবে কয়েক দিন হেঁটে

তিনি এসে পৌঁছুলেন বার্ন-এ। সেখান থেকে পশ্চিম ইউরোপের আমেরিকান হেডকোয়ার্টারে একটি অত্যন্ত মূল্যবান খবর পৌঁছে দিলেন যার ফলে বিপুল ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল আমেরিকার সৈন্য-বাহিনী।

সেই বিখ্যাত মহিলা লেখিকা যুদ্ধের সময় স্পেনের ভিতর দিয়ে ভ্রমন করছিলেন। তাঁর কাজ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্পেনের কনস্যুলার অফিসের উঁচুদরের অফিসারদের মধ্যে কোন্ কোন্ জন নিয়মিত নাৎসী সরকারের টাকা পেয়ে থাকে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা। জার্মানরা কিন্তু তাঁর গতিবিধি মোটেই ভাল চোখে দেখেনি, কী এক দুর্বোধ্য কারণে তার প্রতি সন্দেহ জেগেছিল তাদের। কিন্তু যেহেতু স্পেন নিরপেক্ষ দেশ অতএব তারা কিছু করতে পারছিল না তাঁর বিষয়ে। আর এদিকে সেই অসম্ভব রুপসী ও পৃথিবীজোড়া খ্যাতিমান লেখিকা তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। উঁচু অফিসারদের মহলে অবাধে মেলামেশা করছিলেন এবং এই সময় ফ্রাঙ্কোর ডান হাত একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। সেই আলাপ ক্রমশ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব জানালে তিনি বারবারই তাঁকে আশা দিয়ে সজীব করে রাখ-ছিলেন। এবং অবশেষে বসন্তের একদিনে নিউইয়র্কগামী এক জাহাজে লেখিকা ভদ্রমহিলা সেখান থেকে সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করে নিয়ে পালিয়ে এলেন। পরে অবশ্য সেই ভদ্রমহিলার প্রেমিক পুরুষটি বিচ্ছেদের বেদনায় আত্মহত্যা করেছিলেন।

তারপর সেই অজ্ঞাতনামা মহিলা আরটিমিস্। একটা জাল-পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপনে একটা সাবমেরিনে চড়ে নামলেন এসে নরমাণ্ডিতে। গরুর গাড়ি, ট্রেন কিংবা পায়ে হেঁটে তিনি পার হয়ে গেলেন' ফ্রান্সের এক অজ্ঞাত অঞ্চল, সেখান থেকে ফ্রান্সের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চালাতে লাগলেন আন্দোলন। ফ্রান্সে আসবার আগে আরটিমিসের সঙ্গে জেনারেল দ্য গলের গোপন

বৈঠক বসেছিল লণ্ডনে। তাঁর উপর ভার দেওয়া হয়েছিল ফ্রান্সের বিচ্ছিন্ন তিনটি গুপ্ত সমিতির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা। আরটিমিস্ দেখতেও তেমন ভালো ছিলেন না, বয়সও হয়েছিল তাঁর ঢের, সম্বলের মধ্যে তাঁর ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি। সমিতির লোকজনদের সঙ্গে ফাঁকা খামার বাড়ি বা বনের মধ্যে তাঁর বৈঠক বসত, তিনি তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন বোমার সাহায্যে সেতু বা অন্যান্য যাতায়াতের পথ কী করে উড়িয়ে দিতে হয়। একবার আরটিমিস্ একা একাই একটা সেতু উড়িয়ে দিয়ে জার্মান বাহিনীর কয়েক শ' সৈন্য হত্যা এবং দামী দামী সব অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতি করেছিলেন।

আর সেই মিস্ একস্, হল্যাণ্ডে যাঁর সঙ্গীরা ঘুষ খেয়ে তাঁকে চৌদ্দজন নাৎসি সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। সৈন্যরা তাঁকে মারতে মারতে একটা মাংস স্তূপে পরিণত করে দিয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল। পরে তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এক গ্রামের ভিতর। ভদ্রমহিলা তখন উন্মাদ ও চলচ্ছক্তিহীনা। কয়েক বছর দীর্ঘ চিকিৎসার পব তাঁকে সুস্থ কবা হয়েছিল।

এইভাবে যুদ্ধ বা শান্তি সকল সময়েই এই নারী গুপ্তচর বাহিনী তাঁদের কাজ করে গেছেন, কাজ করে চলেছেন, কাজ করে যাবেন। ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে তাঁদের নাম, কীর্তিস্তম্ভ গড়ে দেবে না কেউ তাঁদেব জন্য। তবু তাঁদের সাহস, বুদ্ধি আর চাতুর্য্যের জন্য কত দেশ কত সব দারুন পরিস্থিতির হাত থেকে বেঁচে যাবে। গোপনে তাঁরা কাজ করে যাবেন, মুখ বুজে অত্যাচার সইবেন, অপমান লাঞ্ছনা গায়ে মাখবেন না।



# একটি ঐতিহাসিক পলায়ন

দুহাতে দেওয়াল আঁকড়ে ধরে তিনি ঝুলন্ত অবস্থায় একবার অন্ধকারের ভেতর ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশ দেখে নিলেন, তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে শব্দ না করে হাতের উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে দেওয়ালের উপর তুলে আনবার চেষ্টা করলেন। এমন মুহূর্ত আর বুঝি পাওয়া যাবে না। যদিও ডিসেম্বরের ভয়ংকর শীত সমস্ত শরীরটাকেই জখম করে দিয়েছে, দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু জমে বরফ খণ্ড হয়ে গেছে, তবুও আজই এই মুহূর্তেই তাঁকে পালাতে হবে। দীর্ঘ তিন সপ্তাহের বন্দী-জীবনে বোয়ার কর্মচারীদের সঙ্গে কেবল আলাপ-আলোচনাই হয়েছে তাঁর কিন্তু কোনো ফল হয় নি। স্বপক্ষে কড়া যুক্তি ছিল, তিনি খবরের কাগজ 'মর্নিং পোস্টের' একজন সংবাদদাতা মাত্র, যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর কোনোই যোগাযোগ নেই। বোয়ার কর্তৃপক্ষ কিন্তু কথাটা কিছুতেই মানল না। তাদের ধারণা, তিনি একজন ভয়ংকর লোক, সেই ট্রেনের যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সাংবাদিকতার কাজ ভুলে গিয়ে বিপক্ষের সৈন্য

দলের হয়ে কাজ করেছিলেন। জেনারেল জোউবার্টের মতে, ট্রেন থেকে ইঞ্জিনটা খুলে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন তিনি অতএব অন্যান্যদের মত তিনিও একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দী মাত্র, তাঁর মুক্তির কোনো কথাই ওঠে না।

স্বাভাবিক পথে যখন হল না তখন বাঁকা পথটাই নিতে হচ্ছে তাঁকে। অবশ্য এই পালানোর ব্যাপারে মডেল স্কুলের তেকোনা গঠনটাও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দু-ধারে লোহার রেলিং, আর অন্য দু-ধারে কাঁটাতারের বেড়া দশ হাত উঁচু। আপাতদৃষ্টিতে বন্দীশিবিরটা দেখতে বেশ সরল সাধাসিধে কিন্তু ভেতরের দিকে দশ হাত অন্তর একজন করে সেপাই পাহারা দিচ্ছে। লোহার রেলিং টপকে যদিও বা পার হওয়া যায়, কিন্তু ঐ সেপাইদের চোখ ফাঁকি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। দিনের পর দিন ক্যাপ্টেন হলডেন আর লেফটেন্যান্ট ব্রোকীকে নিয়ে তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ করে গেছেন, পুব দিকের সেপাই দুজন নিয়মমাফিক পায়চারি করে যখন, তখন পা গুনে হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় দুজন পিঠ ফিরিয়ে কয়েক পা হাঁটে, ঠিক তখনই কয়েকটা মুহূর্তের জন্য তাদের দৃষ্টি থেকে ঘোরানো পায়খানার কাছের দেওয়ালের অংশটা আড়াল হয়ে যায়। এমন কি দেওয়ালের ঐ অংশটায় জোরাল সার্চ লাইটের আলোটাও এসে তেমন ভাবে পৌঁছয় না, খানিকটা আঁধারের ভাব থাকে। সতর্কভাবে লক্ষ্য রেখে ঠিক সময় বুঝে এপাশ থেকে দেওয়ালের উপর উঠে ওপাশে নেমে পড়ে কিছুটা দূর হেঁটে যেতে পারলেই মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই ওঠা-নামার সময়টা অংকের মত নির্ভুল হওয়া চাই, একটু এদিক ওদিক হলেই, গোলমাল করে ফেললেই নির্ঘাত মৃত্যু। বন্দীশিবিরের পাঁচিল টপকে সামনের বাগান পার হয়ে বড় রাস্তায় পা দিলেই যে মুক্তি তারও এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সমস্ত শহরের রাস্তায় মিলিটারির গাড়ি ঘুরছে, তা ছাড়া শহর থেকে পর্তুগীজ সীমান্ত দু'শ আশি মাইল।

ইতিপূর্বে সঙ্গীদের নিয়ে একবার ১১ই ডিসেম্বর চেষ্টা করেছিলেন, সফল হন নি। অতএব ১২ তারিখেই আবার। ঘণ্টাখানেক ধরে সবকিছু ভালো করে দেখে নিয়ে দেওয়ালের উপরটা ধরে হাতের পেশীর জোরে দু-দুবার উঠে আসার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। ভয়ে সমস্ত শরীরটাই হিম হয়ে গিয়েছিল। যা থাকে ভাগ্যে তৃতীয় বারই শেষবার। যেন মরিয়া হয়ে তিনি শরীরটাকে দেওয়ালের উপর তুলে ফেললেন। ওয়েস্টকোটের লোহার বোতামটা একবার আটকে গেল ইটের খাঁজে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কোনো রকমে দেওয়ালের উপর শরারটাকে টেনে তুলে সেপাইদের লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলেন, হাত পনেরো দূরে দুজন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, একজন আবার কথার ফাঁকে দুহাতের ভিতর আড়াল করে সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্রতিটি মুহূর্তই অক্ষয় হয়ে মনের ভিতরে দাগ কেটে যাচ্ছে তাঁর। দূর থেকে তিনি সেপাইটির দুহাতের ভিতর ধরা দেশলাইয়ের কাঠির আগুনের কণাটুকুর উত্তাপও যেন অনুভব করতে পারছিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তও বৃথা যেতে দেবার উপায় নেই, অতএব আস্তে আস্তে কোনো শব্দ না করে তিনি নিজেকে ও-পাশের বাগানের ভিতর নামিয়ে আনলেন। হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। আর সেই মুহূর্তেই আবিষ্কার করতে পারলেন তিনি মুক্ত। গলা ছেড়ে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। গুঁড়ি মেরে মেরে রাস্তার পাশের একটা ঘন ঝোপের ভিতর ঢুকে গেলেন। ঘণ্টা খানেক নড়াচড়া না করে ঝোপের মধ্যে কাটল। অথচ দুজন সঙ্গীর একজনেরও দেখা পাওয়া গেল না। রাস্তা দিয়ে সেপাইরা হরদম যাতায়াত করছে। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা। কিন্তু তিনি কী সঙ্গীদের ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারেন? কী হল ওদের, ধরা পড়ল নাকি? না শেষ পর্যন্ত ভয়ে পিছিয়ে গেল ওরা? ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতর সব কেমন জট পাকিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন

তিনি। হামাগুড়ি দিয়ে দেওয়ালের ধারে এগিয়ে গেলেন, ঝোপটা একটু ফাঁক করতে দেখতে পেলেন দুজন অফিসার রাস্তায় অলস ভাবে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের মধ্যে ল্যাটিন ভাষায় কী বলাবলি করে হাসছে, ওদের কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর নামটাও উচ্চারিত হতে শুনলেন তিনি বার কয়েক, 'আরে না, না, এখান থেকে পালানো অত সোজা নয়।' গলার ভেতর জ্বালা করছে, কাশিটা মুখ বুজে গিলে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত ধরা হয়ত পড়তেই হবে তবু সাহস করে একবার এগিয়ে যাওয়া যাক : নিজেকে উদ্দেশ্য করেই মনে মনে কথাটা বললেন। না আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন রাস্তাটা ফাকা, দূরে গেটের কাছে কেবলমাত্র একজন সেপাই দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। সাহসে ভর করে তিনি কোটের কলার দুটো তুলে দিয়ে রাস্তায় নেমে সোজা হেঁটে চললেন। তার মুখটা সকলেরই বিশেষ পরিচিত, পদে পদে বিপদের আশংকা তবু এক মুহূর্তও ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে গেট পার হয়ে গেলেন তিনি সোজা। আশ্চর্য, সেপাইটি তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না। দূরে গিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সেপাইটি অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে পা গুনে গুনে গেট পাহারা দিয়ে চলেছে।

বড় রাস্তায় পা দিয়ে চলার গতিটা অলস মন্থর হল, রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটা লক্কা ছোকরার মত গানের সুরে শিস দিতে দিতে হেঁটে চললেন তিনি। রাস্তা ভর্তি লোকজন কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে শহর পার হয়ে শহরতলির নির্জন স্ট্রীটটার উপর এসে বসে পড়লেন। পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটাই ঝিমঝিম করছে। এখনও তিনশ' মাইল পার হয়ে তবে টিলাগোয়াবে। অথচ ভোরবেলার মধ্যেই নিশ্চিত পালানোর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে, খোঁজাখুঁজি হবে। ট্রেনগুলো কড়া ভাবে চেক করা হবে, রেল লাইনের দুধারে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সেপাই বসবে। একবার নিজের দিকে

চোখ ফেরালেন তিনি, গায়ে ব্রাউন রঙের একটা স্যুট, পকেটে পঁচাত্তর পাউণ্ড আর চার বাক্স চকোলেট। বেশীর ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিসই সঙ্গীদের সঙ্গে রয়ে গেছে, কম্পাস, ম্যাপ, আফিমের বড়ি বা মাংসের লজেন্সগুলো। সবচেয়ে অসুবিধা ভাষার ব্যাপারে। একটাও ডাচ বা কাফির শব্দ মুখ দিয়ে বেরোয় না তাঁর। অতএব প্রায় নিঃসম্বল অবস্থাতেই পথ চলতে হয় তাকে। মনে মনে একটা ছক করে নিলেন, যে করেই হোক টিলাগোয়াবের রেলপথটা ধরতে হবে তাঁকে, অথচ দিক নির্ণয়ের কম্পাসটাই হাতছাড়া। মুখ তুলে একবার আকাশে তাকালেন, উজ্বল হয়ে জ্বলছে ওরিয়ান, তাঁর মনে পড়ল বছরখানেক আগে একবার নাইলের পাড়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেদিন ঐ তারাটাই তাঁকে দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করেছিল। আজও একবার সাহায্যের আশায় মুখ তুলে আকাশে তাকালেন, তারপর দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই একটা রেল লাইনের কাছে পৌঁছে দাঁড়ালেন খানিক। মনে প্রশ্ন দেখা দিল কোন লাইন এটা, টিলাগোয়াবের না পিটারবার্গের। ঠিক করে উঠতে পারলেন না কিছুতে। কিন্তু কপালে যা থাকে ঐ রেলপথ ধরেই হেঁটে চললেন তিনি। অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনাময় বলে মনে হল রাত্রিটাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে মানসিক উত্তেজনাটা শান্ত হল। শরীরটা ঝরঝরে লাগতে লাগল। যতই কম সময়ের জন্য হোক, হয়ত মাত্র এক ঘণ্টার জন্য, তবুও তো তিনি স্বাধীন। সহজ ভাবে হাঁটতে লাগলেন, লাইনের বাঁকে বাঁকে সার্চ লাইটের আলো জ্বলল, নিবল, ব্রিজগুলোর কড়া পাহারাও পার হয়ে গেলেন তিনি অনায়াসে। সৌভাগ্য যেন তাঁকে হাত ধরে পার করে দিল সমস্ত বিপজ্জনক স্থানগুলো। হাঁটতে নতুন ফন্দি মাথায় এলো তাঁর, তিনশ' মাইল হেঁটে পার হওয়া যাবে না, যান-বাহনের সাহায্য নিতে হবে, সবচেয়ে সুবিধা হল রেলগাড়ীর বেঞ্চের তলায় বা ট্রেনের ছাদে। ঐসব জায়গায় লুকিয়ে থাকার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে। ঘণ্টা দুয়েক হাঁটবার পর দূরে একটা ষ্টেশনের

সিগন্যালের আলো চোখে পড়ল। সাবধানে ঘুরে গিয়ে ষ্টেশনের দু'শ গজ দূরে লাইনের ধারে একটা গর্তের মধ্যে গুড়িসুড়ি মেরে বসে ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেইভাবে একঘণ্টা কাটানোর পর ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল দূর থেকে। ভীষণ শব্দে আলো ফেলে ফেলে একটা ট্রেন এসে মিনিট পাঁচেকের জন্য ষ্টেশনটায় দাঁড়ালো। আর তিনি গর্ত থেকে বেরিয়ে লাইনের ধারে ওত পেতে দাঁড়ালেন, ট্রেনটা চলতে শুরু করলেই যে করেই হোক উঠে পড়বেন। তীব্র হুইসেল দিয়ে ট্রেনটা ছাড়ল একসময়। একটু একটু করে তার গতি বাড়তে লাগল, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে ঝাঁপ দিলেন, প্রথমবার হাত ফসকাল, চকিতে একবার জ্বলন্ত চুল্লী র সামনে ইঞ্জিন ড্রাইভারের জোয়ান শরীরটা দেখা গেল, তিনি দ্বিতীয়বার ঝাঁপ দিলেন, সেবারেও হাতটা পিছলে এলো, মরিয়া হয়ে তিনি শেষবারের মত ঝাঁপ দিলেন ট্রেনটার গায়ে, হাতে একটা হ্যাণ্ডেলের মত কী ঠেকল, প্রাণপণে ঝুলন্ত অবস্থাতেই সেটাকে চেপে ধরলেন, পা দুটো লাইনের উপর ঘষা খেতে খেতে চলল কিছুটা, সমস্ত শরীরটা মুচড়ে উঠল ব্যথায়, প্রতি পলকে চোখে অন্ধকার দেখলেন, তারপরে কোনোরকমে আস্তে আস্তে শরীরটাকে তুলে আনলেন ট্রেনের একটা খাঁজের উপর, পা আটকে সামলে নিলেন কোনোরকমে। ট্রেনটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিতে গিয়ে বুঝলেন ওটা একটা মালগাড়ি। খোলা অংশ দিয়ে ওয়াগনের ভিতরে লাফিয়ে নেমে দেখতে পেলেন কয়লার খালিবস্তা, আর গুঁড়ো। মিনিট পাঁচেকের জন্য কয়লার গুঁড়োর মধ্যে শরীরটা ডুবে গেল তাঁর, গা ঝেড়ে উঠে একটা মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় বসে শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন তারপর। বেশ আরামদায়ক মনে হল জাগাটাকে, পরিশ্রান্ত অবসন্ন শরীরটা ততক্ষণে ঝিমঝিম করতে লাগল, আর ভীষণ ঘুম পেলো তাঁব।

হঠাৎ একসময় ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেলে মুখ তুলে দেখলেন আকাশ তখনও অন্ধকার, শরীরটা বেশ ঝরঝরে, ভোর হবার তখনও কিছু সময় বাকী আছে। অতএব আর অপেক্ষা করা ঠিক

হবে না বুঝে নিয়ে রেলিং ধরে পিছনের দিকে চলে এলেন, তারপর চোখ বুজে নিজেকে ছেড়ে দিলেন মাটির দিকে। দেহটা প্রথম ছিটকে গিয়ে পড়ল মাটিতে তারপর গড়িয়ে গেল পাশের একটা গর্তে। আশ্চর্য, এতোতেও একটু আঘাত পেলেন না। ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশ লক্ষ্য করে দেখলেন, নীচু নীচু ঢিবি আর উঁচু ঘাসের বনে জায়গাটা অদ্ভুত। হেঁটে হেঁটে তিনি একটা পুকুরের ধারে গেলেন, অনেকক্ষণ ধরে পেটপুরে জল খেলেন আঁজলা ভরে, শরীরটা শীতল হল।

আস্তে আস্তে আকাশে আলো ফুটলো, ক্রমশ হলুদ হল, তারপর লাল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি একটা ছায়া-মেলা ঘন-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা খুঁজে নিলেন। তারপর সেখানে সারাদিন লুকিয়ে বসে থেকে শুধু দূরের রেল লাইনে দুটো তিনটে ট্রেনের চলাচল দেখলেন। খুব মন্থর ভাবে মালগাড়ীর চাকাগুলো লাইনের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাইল তিনেক পশ্চিমে ছোট একটা বিন্দুর মত একটা গ্রাম, কয়েকটা টিনের বাড়ী, মুহূর্তগুলো সারাদিন পাথরের মত ভারী হয়ে বুকের উপর চেপে বসে। জীবন্ত সঙ্গী বলতে, সারাদিন ধরে খুব নিকট থেকে একটা মস্ত শকুন তাঁকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসে পাহারা দিল কেবল। কোনো কিছুই ভাবতে পরেলেন না, মনটা সারাদিন শুন্য খাঁ-খাঁ হয়ে রইল, খিদের সময় প্যাকেট থেকে চকোলেট মুখে দিলেন, তাতে আবার তৃষ্ণায় গলা-বুক শুকিয়ে এল; কিন্তু সাহস পেলেন না দিনের বেলায় ঝোপ থেকে বেরিয়ে পুকুর থেকে জল খেয়ে আসতে। তারপর এক সময় সূর্য্য অস্ত গেল, আকাশে ছায়া নামল, কাফিররা গরু চরিয়ে ঘরে ফিরল। আর একটু অন্ধকার হতেই তিনি পুকুর থেকে জল খেয়ে সোজা রেল লাইনের বাঁকের মুখে ঝোপের ভিতর গিয়ে বসলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় কাটিয়ে দেবার পর একটি ট্রেনের দেখা পেলেন, কিন্তু হতাশ হতে হল তাঁকে। গত্যন্তর নেই দেখে অবশেষে আবার লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। ঘোরা

পথে পাহারা এড়িয়ে বনজঙ্গল কাদা ভেঙে এগুতে হল তাঁকে। আর কিছুদূর হাঁটবার পর একটা ছোট্ট রেল স্টেশন চোখে পড়ল তাঁর, চাঁদের আলোয় তিনটে ট্রেনকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝলেন রাত্রি বেলায় এপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ। সাহস করে একটু এগিয়ে এসে ট্রেনের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন স্টেশনে আলো জ্বলছে আর গাদা গাদা কাফির প্ল্যাটফর্মে গোল হয়ে বসে বসে গলা চড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। অতএব কোনো আশা আর নেই দেখে এবং যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি আবার রেল লাইনের ধারের ঝোপে ফিরে এলেন। চারপাশ তাকিয়ে জায়গাটার অবস্থান সম্বন্ধে আন্দাজ করে নিতে গিয়ে দেখলেন দূরে বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলছে, বাঁ-পাশের জঙ্গলে দু-একটা আগুনের কুণ্ডও চোখে পড়ল তাঁর। একবার মনে হল কাফিরদের কাছে গিয়ে সোজাসুজি আশ্রয় ভিক্ষা করবেন, কারণ কবে যেন শুনে-ছিলেন কাফিরবা বোয়ারদের মনে মনে ঘৃণা করে, বৃটিশদের সঙ্গে তাদের মোটামুটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। মনে হল হয়ত চাইলে তারা বন্দী না করে কিছু খাবারদাবার, বিছানাপত্তর দিতে পারে, যদিও নিজের অবস্থাটা তাদের বোঝানোর মত ভাষা জানা নেই তবুও হয়ত তারা বৃটিশ ব্যাঙ্কের নোট দেখলে খাতির করবে তাঁকে। অতএব আর দেরি না করে ঐ আগুনের কুণ্ডগুলো লক্ষ করে এগুতে লাগলেন তিনি, কিন্তু অন্ধকারে অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টিভ্রম হল তাঁর, হেঁটে হেঁটে পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়, তবুও কয়েক মাইল হেঁটেও তিনি ঐ আগুনের কুণ্ডগুলো খুঁজে পেলেন না কিছুতে। ফেরবার পথে তিনি বাঁদিকের রাস্তাটা ধরলেন, খানিকটা ঘোরাপথে কিছুটা হাঁটবার পরই দুতলা গুটি কয়েক পাথরের তৈরী দালান-কোঠা চোখে পড়ল। বাড়ীগুলো দেখে মনে নতুন আশার উদয় হল, মনে হল হয়ত ঘুরতে ঘুরতে কয়লা খাদের শহর উইটব্যাংক বা মিডেলবার্গে এসে পৌঁছেছেন। আর এই সব কয়লা খাদের অঞ্চলে তিনি জানেন কিছু কিছু ইংরেজ বসবাস

করে। অতএব একবার যদি তাদের কাউকে খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে পয়সার লোভ দেখিয়েও তিনি কিছু সুযোগ সুবিধা পেতে পারবেন তাদের কাছ থেকে।

অতএব কোনোরকম দ্বিরুক্তি না করে তিনি সোজা গিয়ে প্রথম বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লেন। প্রথমবার কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা, দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দুর্বোধ্য ভাষায় একজন পুরুষ মানুষের গলা শোনা গেল। ভাগ্যে যা থাকে ভেবে নিয়ে মরিয়া হয়ে তিনি ইংরেজীতে বলে উঠলেন:

'দয়া করে একবার দরজাটা খুলুন, আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, আমি আপনার সাহায্য চাই।'

ভেতর থেকে এবার গলা খাঁকারির আওয়াজ পাওয়া গেল তারপর খিল খোলার শব্দ হল। দরজাটা খুলে যেতেই তিনি দেখলেন প্যাসেজের অন্ধকারে একজন লম্বা-চওড়া মানুষ দাঁড়িয়ে আবছাভাবে তার ফ্যাকাশে মুখশ্রী এবং গোঁফের রেখাগুলোও দেখা গেল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাড়ীর কর্তা প্রথম ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই আপনার?'

'আমি একজন ব্যবসায়ী কোনতি পোর্টে আমার লোকজনদের দেখা করতে যাবার পথে আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, ট্রেন থেকে পড়ে গেছি আমি একঘন্টার উপর অজ্ঞান হয়েছিলাম, জ্ঞান হবার পর মনে হচ্ছে আমার কাঁধের হাড়টা ভেঙে গেছে।' নিজের অজান্তেই আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে তিনি গড় গড় করে বানানো একটা গল্প বলে ফেললেন মুহূর্তের মধ্যে।

গৃহস্বামী কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, ভেতরে আসুন।'

বাড়ীর ভেতর ঢুকে টানা লম্বা অন্ধকার বারান্দাটা দিয়ে গৃহস্বামী আগে আগে হেঁটে গিয়ে বা-হাতের একটা অন্ধকার ঘর দেখিয়ে তাঁকে

ঢুকতে বললেন। তারপর ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে বাতিটা টেবিলের উপর রাখলেন। তিনি তখনও দাঁড়িয়ে, আলো জ্বলে উঠতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশটি দেখে নিলেন। একেবারে ছোট একটা ঘর, খাবার এবং বসবার ঘর একত্রে, লম্বা একটা টেবিল, গুটিকয়েক চেয়ার, সোডা তৈরীর একটা মেশিন আর তারের জাল দেওয়া একটা আলমারি। টেবিলের উপর একটা খাপ খোলা রিভালবারও দেখতে পেলেন। গৃহস্বামী আলোটা জ্বেলে আস্তে আস্তে রিভলবারটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন, তারপর কঠিন গলায় থেমে থেমে বলে উঠলেন,

'এইবার সত্যি কথাটা বলুন, আমার মনে হচ্ছে ঐ রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটা আমার আরো ভালো করে জানা দরকার।'

'বেশ তাহলে সত্যি কথাটাই বলি আপনাকে।'

'সেটাই তো আশা করছি আপনার কাছ থেকে।'

'তাহলে শুনুন, আমার নাম উন্‌স্টন চার্চিল, 'মানিং পোস্টে'র সাংবাদিক আমি। গতকাল রাত্রে প্রোটেরিয়া বন্দীশিবির থেকে পালিয়েছি। সীমান্ত পার হওয়া আমার উদ্দেশ্য, বেশ কিছু টাকাকড়ি আছে আমার কাছে। অতএব পলায়নের ব্যাপারে আমি আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাই।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, দ্রুতপায়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর দৌড়ে কাছে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন,

'যাক, শেষ পর্যন্ত আপনি ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। কুড়ি মাইলের মধ্যে এই জায়গাটাই একমাত্র আমাদের হাতে আছে। এখানকার সমস্ত লোকজনই ব্রিটিশ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সবাই আপনাকে সাহায্য করবেন।'

•গৃহস্বামীর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যেন মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তিই তাঁর নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এইবার বিশ্রাম। আর তাঁর কিছু করবার নেই। শ্রান্তি আর উত্তেজনার অবসানে তিনি আর কোনো কথা না বলে সামনের চেয়ারটার উপর এলিয়ে বসে পড়লেন।



## মানুষ মানুষী

আশ্চর্য্য সুন্দব ছিলেন তিনি  লণ্ডনেব তৎকালীন যুগেব এক বিখ্যাত সার্জেনেব মতামত অনুসাবে তাব বক্ষ ও গ্রীবাব গঠন ছিল অনবদ্য। পোষাক পবিচ্ছদেব ব্যাপাবে তিনি ছিলেন সব চযে আধুনিক। সব সময দেখা যেত সাদা লেস বসানো পোষাক পবিচ্ছদ পবিধান কবতে। তাকে দেখলে মনে হত তিনি যেন সবে মাত্র কোনো বিখ্যাত চিত্রকবেব ছবি থেকে বেবিযে এসেছেন। শুভ্র পোশাকেব ভেতব থেকে অর্ধস্ফুট ভাবে উন্মোচিত হয়ে আছে বক্ষ, গ্রীবা, কাঁধেব অংশ অনাবৃত; কনুইযেব কাছে জামাব হাতা ফুলে আছে, কেবল মাত্র সৌন্দর্য্যেব ক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন দিকে ছিল তাঁব বিশিষ্টতা। বহুভাষায় ছিল তাঁব অনাযাস দক্ষতা, ইতালীয় সঙ্গীতে বিশেষ পাবদর্শিতা, বটানিতে ছিল সবিশেষ জ্ঞান, চেলসিতে তিনি যে গাছপালা সংবক্ষণের জন্য একান্ত ব্যক্তিগত একটা বাগান তৈবী কবিয়েছিলেন, সেখানে নানা দুস্প্রাপ্য ধরনেব গাছ-গাছালি জন্মাত। এ ছাডাও ওব মাঝারী

ধরনের কবিত্বশক্তি ছিল। এ হেন অষ্টাদশী মেরী এ্যলেনার বাউজ সকলের অমতে বিয়ে করে বসলেন স্ট্র্যাথ্‌মোরের নবম আর্ল উনতিরিশ বছরের জন লেয়নকে। ফলে পার্লামেণ্টে একটা নতুন আইন পাশ করে জনকে কেবলমাত্র বাউজ উপাধিটা ব্যবহার করবার অধিকার দেওয়া হল। স্ট্র্যাথ্‌মোরের আর্ল হলেন বাউজ লেয়ন। পরবর্তীকালেও ইংলণ্ডের রানীর মাকে অবিবাহিত অবস্থায় লেডি এলিজাবেথ বাউজ লেয়ন নামেই দেখা গেছে।

যদিও জন মানসিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় তাঁর অষ্টাদশী গুণবতী স্ত্রীর সমকক্ষ ছিলেন না বরং অত্যন্ত নির্বোধ ছিল তাঁর কথাবার্তা, এক গেলাস মদ আর তাশ খেলাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সুখ ও আনন্দ, কিন্তু তবুও মানুষ হিসাবে ছিলেন তিনি শান্ত মেজাজের, হাসিখুসি আর উদার স্বভাবের। স্ত্রীর কোনো কাজেই হস্তক্ষেপ করতেন না। বরং সসভ্রমের সঙ্গে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। নিজেকে নিয়েই সারাদিন কাটত মেরীর আর সন্ধেবেলা তাঁর পছন্দ মত আসর বসত প্রাসাদে। সে আসরে জনের কোনো স্থান ছিল না। যদিও মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত হবার জন্য ডাক পড়ত জনের, কিন্তু কোনো কথা বলবার সুযোগ হত না তাঁর। মেরীর নির্দেশ অনুসারে আসরের ঐ জ্ঞানীগুনী জনতাকে কেবলমাত্র মুখের হাসি দিয়ে একটিবার মাত্র অভ্যর্থনা করে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতে হত তাঁকে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত সেই সব আসর, আর নির্জন বন্ধ ঘরে বসে একা একা জন আসরের সেই কলকোলাহল শুনতেন।

স্ত্রীর সঙ্গে মানষিক গরমিল থাকা সত্ত্বেও পাঁচটিবার জনক হয়েছিলেন জন লেয়ন। তাঁর তিনটি পুত্র আর দুটি কন্যার মধ্যে টমাস পরবর্তী জীবনে রানীর মার প্রপিতামহ হয়েছিলেন। কিন্তু সে যাই হোক, অতগুলি সন্তানের জননী হয়েও মেরীর রূপ, স্বাস্থ্য বা উচ্ছলতা এতটুকু নষ্ট হয়নি। বরং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেরী হয়ে উঠেছিলেন আরো তন্বী ও রূপসী। সামাজিক মেলামেশায় তাঁর উচ্ছল

মেজাজ অনেককে আনন্দ দিত। তারপর হঠাৎ ১৭৭৬ সালে এক রহস্যময় রোগে ভুগে জন যখন মারা গেলেন, মেরী একটি দিনের জন্যও শোক পালন করলেন না। তাঁকে দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল এতদিনে যেন মুক্তি পেয়েছেন তিনি।

এরপর মেরীকে দেখা যেতে লাগল অত্যুজ্জ্বল পোশাক পরিচ্ছদে সহচর বৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঘুরে বেড়াতে। সবচেয়ে দামী মণি-মুক্তার গহনা পরিহিত অবস্থায় তিনি দেখা দিতে লাগলেন অপেরা-গুলোয়। তাঁকে তখন দেখে মনে হত বয়স যেন অনেক কমে গেছে, নিজেকে যেন আর সমেলে রাখতে পারছেন না তিনি। মদিবতা এসেছে ওষ্ঠে, পরিপূর্ণতায় ভরে গেছে দেহ, যদিও বয়স তখন সাতাশ চলছে তাঁর। চারিপাশ ঘিরে ওর গুনমুগ্ধ প্রেমিকের দল। আর সম্রাজ্ঞীর মত মেরী প্রজাপুঞ্জের উপর রাজত্ব করে চলেছেন। যদিও ওর অন্তরঙ্গ পরিচিত মহলে একটা কথা চালু হয়ে গেছে তখন, 'সব আছে মেরীর কিন্তু বুদ্ধিটা একটু খাটো।' কিন্তু একথা ঠিক, তাঁর ছোট ছোট সুন্দর ছন্দে লেখা প্রেমের কবিতাগুলো মুগ্ধ করেছে সকলকে, নানা ভাষায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা, বটানি বিষয়ে গভীর জ্ঞান পণ্ডিতসমাজকেও আলোড়িত করেছে। সমাজের সব স্তরের পুরুষের চোখ তখন মেরীর দিকে, সমস্ত আসরেই মেরীকে নিয়ে আলোচনা। মহিলাদের আসরে মেরীর দ্বিতীয় স্বামীটি কে হবেন তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা।

আর ততদিনে অত্যন্ত গোপনে মেরী তাঁর দ্বিতীয় স্বামীটিকে বেছে ফেলেছেন। ডিউক অফ সাসেক্সের ভাগ্নে জর্জ গ্রে। মার্জিত রুচিসম্পন্ন শান্ত স্বভাবের মানুষ জর্জ। মেরীর প্রেমে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যে কোনো শর্তেই তিনি মেরীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। অতএব খুব তাড়াতাড়িই সামাজিক আসরে মেরী ও জর্জের প্রেম নিয়ে তুমুল আলোড়ন উঠল। মেরী শুধু গুনবতীই নন প্রভূত বিত্তশালীও বটে।

আশ্চর্য্য, সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গিয়েও মেরী ও জর্জ গ্রের বিয়েটা কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত হল না। অসম্ভব চতুর ও নিষ্ঠুর, অত্যন্ত নগণ্য এক সাধারন মানুষ এই বিয়েতে বাধ সাধলেন। ঘটনাটা ঘটল আকস্মিকভাবে।

সেই অজ্ঞ তনামা রহস্যময় পুরুষটির নাম এ্যাণ্ড্রু রোবিনসন স্টোনী। তাঁর পূর্বব জীবন সম্বন্ধে যে তথ্যটুকু জানা যায় তা যেমন ভয়াবহ তেমন নিষ্ঠুর। অথচ চেহারাটি ছিল তাঁর মনমাতান; লম্বা, সবল, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, অসম্ভব উজ্জ্বল গায়ের রঙ, নরম রেশমের মত চুল, ধারাল কথাবার্তা, রসিক মেজাজ। ভদ্রলোক জর্জ গ্রের থেকে দশ বছরের ছোট। পয়সাকড়ি বলতে তাঁর কিছুই ছিল না, সৈনিক জীবনে পদোন্নতি হয়ে একজন লেফটেন্যান্ট পর্য্যন্ত হয়েছিলেন, তারপর চাকরি থেকে অল্পবয়সে অবসর নিয়ে অর্দ্ধেক মাইনেতে সেণ্ট জেমস্ কফি হাউসের একটা ছোট নোংরা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিল। যদিও ভদ্রমহিলার উপর অপরিসাম অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি। একবার তো শোনা যায় ঐ ছোটখাটো শান্ত স্বভাবের ভদ্রমহিলাটিকে শেমিজপরা অবস্থায় তিনদিন একটা বাক্সের মধ্যে জোর করে চেপে বন্ধ করে রেখেছিলেন, দিনে একটা করে ডিম ছিল ভদ্রমহিলার বরাদ্দ খাদ্য। অন্যবার তিনি মহিলাটিকে ঠাণ্ডা জলের পুকুরের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে কাপড় জামা নিয়ে হ্যানা নিউটনের পৈতৃক প্রাসাদ কোল্ডপিগ হলে চলে এসেছিলেন। সারাদিন ধরে ঐ ঠাণ্ডা জলের পুকুরে শরীর ডুবিয়ে বসে থেকে সন্ধেবেলা অন্ধকারে হ্যানা জল থেকে উঠে প্রাসাদে এসে তবে জামাকাপড় পরতে পেরেছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই স্টোনী হ্যানার প্রাসাদ ও সম্পত্তি বিক্রি করে তিরিশ হাজার পাউণ্ড জুয়ায় উড়িয়ে দেন এবং নিঃস্ব হয়ে এক দুর্বোধ্য কারণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে হ্যানার পোষাক পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে তাঁর গায়ের উপর মৌমাছি ছেড়ে দেন। সারাদিন পর মৌমাছির দংশনে মৃতপ্রায় হ্যানাকে যখন বন্ধ ঘর থেকে বের করে আনা

হয় তখনও তাঁর প্রাণ ছিল। আর সেদিনই রাত্রে সেই মৃতপ্রায় হ্যানার খাবারে একটা বিশেষ ধরনের বিষ মিশিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে হত্যা করেন। হ্যানার এই আকস্মিক মৃত্যুতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল যদিও। কিন্তু যেহেতু স্টোনীর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, অতএব হ্যানার আত্মিয়স্বজন এ বিষয় নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। আর স্টোনীও শোকার্ত মুখে তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে কবর দেবার নাম করে ঠকিয়ে প্রভূত অর্থ আদায় করে নেন তাঁদের কাছ থেকে। এ হেন চরিত্রের মানুষ রোবিনসন স্টোনীকে খুব অল্পদিনের মধ্যেই গ্রোস্‌ভেনার স্কোয়ারের সবচেয়ে রূপসী ও বিত্তশালী মেরী এ্যালেনার বাউজ-এর সান্ধ্য আসরে আবিষ্কার করা গেল।

প্রতিদিনই সন্ধ্যায় নিয়মিত হাজিরা দেন রোবিনসন স্টোনী, মেরী বাউজের আসরে। বেশীরভাগ সময়েই দেখা যায় তাঁকে শান্তভাবে একটা সোফায় চুপচাপ বসে থাকতে একজন সাধারণ দর্শকের ভঙ্গীতে। যদিও মাঝে মাঝে দু-একটা অসম্ভব রসিকতা করেন তিনি, হাসিতে ভেঙে পড়ে আসর।

প্রতিদিন ঠিক একই ভঙ্গীতে মেরীর প্রাসাদে আসেন স্টোনী আর শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যান। এইভাবে মাসখানেক যাবার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার চিঠি এসে পৌঁছোয় মেরীর হাতে। চিঠিটা ডুরহাম থেকে পোস্ট করা হয়েছে। চিঠিটা এসেছে এক হতভাগিনীর কাছ থেকে, অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় একজন মহিলা লিখেছেন মেরীকে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা। মহিলার প্রেমিক রোবিনসন স্টোনী এই কিছুদিন হল মেরী এ্যালেনার বাউজের প্রেমে এমন উন্মত্ত হয়ে গেছেন, যে তাঁকে অবহেলা করতে সুরু করেছেন, অতএব মহিলাটির বিনীত নিবেদন হল মেরী যেন যত তাড়াতাড়ি পারেন মিঃ গ্রেকে বিবাহ করে ফেলেন। তাতে হয়ত আঘাত পেয়ে রোবিনসন স্টোনী আবার তাঁর কাছে এসে ধরা দেবেন। যেহেতু কোমল হৃদয় বলে মেরী বাউজ-এর খ্যাতি আছে অতএব মহিলাটি বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁর কথা রাখবেন।

আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে একটি মহিলার হাতের লেখা নকল করে ডুর্‌হাম গিয়ে চিঠিটি পোস্ট করে শহরে ফিরে আসতে স্টোনীর যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই মেরী বাউজ-এর কাছ থেকে প্রার্থিত ফলটা পান স্টোনী।

অজ্ঞাতনামা মহিলাটির চিঠিটা মেরী বাউজের হাতে পৌঁছোনোর পরদিন সন্ধ্যায় নিয়মমত সন্ধ্যার আসরে রোবিনসন স্টোনী পদার্পণ করা মাত্র মেরী অপলকভাবে স্টোনীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকান। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি ঐ নীরব প্রেমিকটির মুখের উপর থেকে নিজের দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিতে ভুলে যান তারপর একসময় সলজ্জভাবে মেরী স্টোনীকে নিজের পাশে এসে বসবার নির্দেশ দেন। স্টোনীও নিতান্ত লাজুক প্রেমিকের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সূচনায় অস্থির হয়ে এসে সোফায় মেরার পাশে বসেন।

তারপর কয়েকটা দিন নীরব থাকবার পর আবার ডুর্‌হাম থেকে সেই অজ্ঞাতনামা মহিলাটির চিঠি আসে মেরীর কাছে। পূর্বের সেই একই বক্তব্য ও মিনতিপূর্ণ আবেদন নিয়ে আসে পত্রটি। 'দয়াময়ী' এক নগণ্য তরুণীর প্রেমিটিকে ফিরিয়ে দিন।' চিঠিটা শেষ করে হেসে ওঠেন মেরী বাউজ। এ সত্য তো বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সে সকল পুরুষেরই হৃদয়েশ্বরী কিন্তু তবু এ সত্যটা কোনো হতভাগিনী নারীর মুখে শুনতে যেন আরো মনোহর আরো উত্তেজক লাগে। এতএব কয়েকটা দিন মেরী বাউজের সাদর প্রশ্রয়ে যেন ধন্য হয়ে যান রবিনসন স্টোনী। যেন বড় ঘনিষ্ঠ হয়েই মেরীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে আসন অধিকার করে বসেন তিনি। কয়েকটা দিনের জন্য যেন আরো ব্যক্তিত্বপূর্ণ রসিক দেখায় স্টোনীকে। তাঁর রঙ্গ-রসিকতায় আসরের সকলে প্রায় পাগল হয়ে যায়। হাসতে হাসতে তাঁদের যেন এক এক সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

আর ঠিক এই সময় একদিন গ্রসভেনার স্কোয়ারের সন্ধ্যার আসরে এক নতুনত্বের আমদানী হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী এক

বেদেনীকে নিয়ে আসা হয় সেখানে। একে একে নির্ভুলভাবে আসরের সকলের অতীতের ঘটনাগুলি বলা শেষ করে বেদেনীটি মেরী বাউজের হাতের রেখায় মনোনিবেশ করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেরীর অতীত কাহিনী বলা শেষ হলে সে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর রূপ ও গুণাবলীর বর্ণনা করে যায়। এবং সকলে আশ্চর্য হয়ে শোনে মেরীর ভবিষ্যৎ স্বামীর রূপ ও চরিত্রের বর্ণনার সঙ্গে রোবিনসন স্টোনীর রূপ ও চরিত্রের অদ্ভুত একটা মিল আছে গ্রের উপস্থিতিতেও অনেকে অস্ফুটে বলে ওঠে 'মিঃ স্টোনীই তবে মেরীর স্বামী হবেন।' সলজ্জ একটু হাসি ফুটে ওঠে রোবিনসন স্টোনীর ওষ্ঠে। কিন্তু আসরের কারো পক্ষেই সন্দেহ করার কোনো সুযোগ থাকে না যে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিনী বেদেনীটি মেরীর প্রাসাদে পদার্পণ করবার কিছু পূর্বে মিঃ স্টোনীর কাছ থেকে মোটা অংকের একটা টাকা ঘুষ খেয়ে এসেছে। বেদেনীর ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যায় কিন্তু তেমন করে মন ভরে না মেরীর। যদিও মিঃ স্টোনী তাঁর প্রিয়পাত্র, বুদ্ধিমান, সুপুরুষ কিন্তু তিনি তো আর গ্রে নন। তার মন জুড়ে যে গ্রে বিরাজ করছেন সব সময়। কী করে তিনি তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলে দেবেন। মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন মেরী। অশান্তিতে কাটল তার কয়েকটা দিন। একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে তিনি কেবল দুলতে লাগলেন।

আর যেন ঠিক সময় বুঝেই 'মর্নিং পোস্ট' খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মেরীর চরিত্র বিষয়ে গালাগালি করে একটি নোংরা চিঠি প্রকাশিত হল একদিন। চিঠিটির লেখক একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। মেরী বাউজ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটি যেন সহ্য হল না মিঃ স্টোনীর। মেরী বাউজের পক্ষ নিয়ে তিনি 'মর্নিং পোস্ট' কাগজের সম্পাদককে ডুয়েলে আহ্বান জানালেন।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় মিঃ জন হাল এডলফি হোটেলের এক ঘরে তরবারির ঝনঝন্ শব্দ শুনতে পেলেন। ছুটে তারপরে সেই ঘরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন ঘরের আলোগুলি নেভান। তবুও সেই

আবছা অন্ধকারের মধ্যে তরবারি হাতে মিঃ স্টোনী ও 'মর্নিং পোস্টের' সম্পাদককে চিনে নিতে অসুবিধা হল না তাঁর। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে স্টোনীর হাত থেকে তরবারিটা কেড়ে নিতে গেলেন। শক্ত করে স্টোনীর হাতটা ধরে ফেললে পর একটি বিশেষ ডাক্তারের নাম ও ঠিকানা বলে দিয়ে স্টোনী অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন।

ধরাধরি করে অচেতন স্টোনীকে সেই ডাক্তারের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হল। পরদিন সকালবেলা সেই ডাক্তারের কাছ থেকে খবর এল মেরীর কাছে, বুকে ভীষণ দুটি আঘাত পেয়েছেন স্টোনী, গভীর ক্ষত হয়ে গেছে, তাতে অবশ্য কিঞ্চিৎ মৃত্যুর আশঙ্কাও আছে তার। যদিও পরবর্তী অধ্যায়ে স্টোনীর এক ভৃত্য বলেছিল যে ঐ তরবারির যুদ্ধে কোনো আঘাতই লাগে নি স্টোনীর, ডাক্তারের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে, বানানো।

সে যাই হোক, স্টোনীর গুরুতর আঘাতের সংবাদ পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না মেরী বাউজ। ভোরবেলায় ছুটে এলেন স্টোনীর কপট রোগশয্যার পাশে, নতজানু হয়ে বসে পড়লেন মেঝের উপর। তারপর তরবারিটা নিয়ে ফিরে এলেন গ্রসভেনার স্কোয়ারের প্রাসাদে। স্টোনীর তরবারিটাকে মাথার বালিশের পাশে বিছানার উপর রাখলেন মেরী। সেইদিনই সন্ধ্যায় স্টোনীর উদ্দেশ্যে রচনা করলেন এক অপূর্ব পদ্য।

এই ঘটনার তিনদিন পর এক শান্ত সুন্দর ভোরবেলায়, সেণ্ট জেমস্ চার্চে মেরী এ্যালেনারের সঙ্গে বিবাহ হল স্টোনীর। সমাজের সকলে বিস্মিত হল। আর অভিভূত মেরী মিষ্টি করে হাসলেন সকল প্রশ্নের উত্তরে। তাঁর সলজ্জ ভঙ্গীটি দেখে একথা বোঝা গেল আন্তরিকতায় সুখী হয়েছেন তিনি।

বিবাহের পর স্টোনীকে দেখা গেল দু'হাতে টাকা পয়সা ছড়াতে। প্রাসাদে বড় বড় ভোজ দিতে লাগলেন তিনি, জুয়ার আসরে মোটা

মোটা টাকা হারতে লাগলেন স্টোনী প্রতিদিন। একজন সুখী নিষ্কর্মা ধনীর মতই আচার আচরণ হয়ে উঠল তাঁর অল্প দিনে। কিন্তু ক্রমশঃ জীবন যেন অসহ্য হয়ে উঠল মেরী'র পক্ষে। কারণ ধীরে ধীরে তাঁর চোখে স্টোনীর চরিত্রটা ধরা পড়তে লাগল। প্রথমত মোটামুটি ভদ্রতা ও ভালোবাসার ভান করতেন তিনি কিন্তু পরে স্বরূপে প্রকাশিত হল। একটু একটু করে স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করলেন স্টোনী।

আর সমস্ত রাত্রি নীরব ক্রন্দনে, দিনগুলো আতঙ্কমণ্ডিত হয়ে অসহায় জীবন কাটাতে লাগলেন মেরী। তারপর ছ' বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর যখন অসহ্য হয়ে উঠল সবকিছু, ডিভোর্সে'র ব্যবস্থা করে একদিন প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলেন তিনি।

নিরাপদে লুকিয়ে থাকবার জায়গা হিসাবে মেরী বেছে নিলেন ক্রসিটার স্ট্রীটে একজন আত্মীয়ের বাড়ী। কয়েকদিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটল সেখানে। কিন্তু স্টোনী তাঁর লুকোনোর জায়গাটা আবিষ্কার করে ফেললেন একদিন, অতএব মেরীকে পালাতে হল সেখান থেকে। কয়েক সপ্তাহ তারপর মেরী উন্মাদিনীর মত এ ঠিকানা থেকে ও ঠিকানায় ছুটে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রতিবারই যথাসময়ে তাঁকে আবিষ্কার করলেন স্টোনী। শেষ পর্যন্ত উপায়হীন হয়ে মেরী কোর্টের কাছে একজন দেহরক্ষী চেয়ে আবেদন জানালেন। তাঁর আবেদনপত্রে বলা হল স্টোনী একজন অমানুষ, নৃশংশ চরিত্রের লোক। অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে মেরী লিখলেন—অসম্ভব প্রহার, শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করা, সেই ক্ষতগুলি আবার ধারালো ছুরির ফলা দিয়ে খোঁচানো, বেত মারা, লাথিমারা, না খেতে দেওয়া ও অকথ্য যৌন ব্যভিচার।

মেরীর আবেদনপত্রের উত্তরে কোর্ট থেকে লুকাস নামের একজন পুলিসের লোককে তাঁর দেহরক্ষী করে দিল।

কিছুদিন আত্মগোপন করে সমস্ত খবর সংগ্রহ করলেন স্টোনী। সোজাসুজী ভাবে মেরীকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না এ সত্যটাও বুঝলেন। অতএব বাঁকাপথ ধরলেন।

একদিন এক দরিদ্র পল্লীর এক বিশেষ বাড়ীর দরজায় ঘা পড়ল। বাড়ির গৃহিনী অর্থাৎ মিসেস্ লুকাস দরজা খুলে দেখলেন এক সুপুরুষ আগন্তুককে। আশ্চর্য নরম ও সুন্দর স্বভাবের রাজার মত দিল-দরিয়া সেই মানুষটি তাঁকে আস্তে আস্তে তাঁর ভয়ংকর চরিত্রের স্ত্রীর কাহিনীটি শোনালেন। স্ত্রীর জন্য কী মর্মান্তিক মানসিক দুঃখ কষ্ট যে পেয়েছেন তিনি সেকথাও বলতে দ্বিধা করলেন না।

ভদ্রমহিলাটিও রসিয়ে রসিয়ে তাঁর স্বামী অর্থাৎ মেরীর দেহরক্ষী লুকাসের কানে পৌঁছে দিলেন সব কথা যথাসময়ে। আর একদিন সেই লুকাসকে, মেরীকে বাধ্য করে লেখানো এক কদর্য স্বীকারোক্তির কয়েক পৃষ্ঠা পড়েও শোনালেন। ফলে খুব দ্রুত লুকাস আর স্টোনীর মধ্যে একটি আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হল। মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোপনে লুকাসকে আসতে দেখা গেল স্টোনীর প্রাসাদে। নির্জন কক্ষে তাঁদের পানভোজনের আসরও বসতে লাগল ঘন ঘন।

তারপব ১০ই নভেম্বর ১৭৮৬ সালের একটি দিনে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল মেবীর জীবনে। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে একটা দোকানে কিছু জিনিষ কেনাকাটার ছিল মেরীর। লুকাসকে দোকানের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে মেরী দোকানের ভিতরে জিনিষপত্র দেখতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটল। একদল লোক আচমকা এসে সেই দোকানে ঢুকল তারপর মুহূর্তের মধ্যে তারা দোকানদারের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দিল। ভয়ে দিশেহারা হয়ে মেরী দৌড়ে দোকানের ভেতরে একটা ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি দরজায় করাঘাত আর লুকাসের গলা শুনতে পেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে লুকাসের মুখে এক অদ্ভুত সংবাদ শুনতে পেলেন। মেরীকে আটক করার জন্য কোর্ট থেকে খবব এসেছে অতএব যত তাড়াতাড়ী সম্ভব তাঁকে যেতে হবে জজসাহেব লর্ড মেনসৃফিল্ডের বাড়ী হাইগেটে।

দ্বিরুক্তি না করে লুকাসের সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসলেন মেরী। হাইগেট হিলের চৌরাস্তাব মুখে হঠাৎ একসময়

গাড়ীটা থেমে গেল, আর আতঙ্কিত হয়ে মেরী দেখলেন ঘোড়ার গাড়ীর ভেতর লাফ দিয়ে উঠলেন মিঃ স্টোনী। ভয়ে আতঙ্কে মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না তাঁর। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। আর মুহূর্তের মধ্যেই সবল হাতে মেরীকে নিজের দিকে টেনে আনলেন স্টোনী। তারপর সারা রাস্তা ধরে গাড়ীর ভেতর দু-হাতে কিল চড় ঘুসির ঝড় বইয়ে দিলেন স্টোনী মেরীর উপর। একসময় অজ্ঞান হয়ে গাড়ীর ভেতর লুটিয়ে পড়ল মেরীর দেহ।

আর অন্যদিকে কোর্টের দুজন লোক এল স্টোনীর প্রাসাদে শমন-জারীর জন্য। একজন স্টোনীর মত হুবহু চেহারার চাকরকে দামী পোষাক পরা অবস্থায়, একজন মূল্যবান পোষাক পরিহিত দাসীর সঙ্গে বসে থাকতে দেখে কোর্টের লোকেরা ফিরে গেল। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন স্টোনী। মেরীকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন এক তুষার পর্বতের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে ডালিংটনে। সমস্ত দিনরাত্রি ধরে অত্যাচার চলেছে মেরীর উপর। ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায়ও স্টোনীর ধারালো ছুরি ধরা একটা হাত তার বুকের উপর আটকে আছে যাতে সে চীৎকার করে উটতে না পারে।

'শয়তানী' ডালিংটনে আমরা উকিলের বাড়ী যাচ্ছি, সেখানে তোকে আমার বিরুদ্ধে কেসটা তুলে নিতে হবে। আর যদি তা না করিস তাহলে গরম লোহার........।'

আর অবিরল ধারায় বরফ পড়ছে। স্টোনীর কথা শুনতে শুনতে মেরীর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় আর ক্রমশ সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠের উপর।

সারারাত্রি এইভাবে চলার পর ভোর নাগাদ জ্ঞান ফিরে আসে মেরীর। চারিপাশে একবার তাকিয়ে দেখেন পাহাড়ের রাস্তা পার হয়ে তাঁরা একটা ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছেন। এই সময় মাঠের এক প্রান্ত থেকে মানুষের গলার চীৎকার শোনা যায়। মেরী তাকিয়ে দেখেন দূর থেকে মাঠ পেরিয়ে তাঁদের দিকে ছুটে আসছে সরকারি সেপাইদল।

স্টোনীও ব্যাপারটা লক্ষ করে, তারপর কোনো দ্বিধা না করে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

এরপর খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই স্টোনী ও অর্ধচেতন মেরী বাউজ ধরা পড়েন সরকারী সৈন্যদলের হাতে। চারপাশ থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে ধরে তারা স্টোনীর ছুটন্ত ঘোড়াটাকে আটকায়।

ধরা পড়বার পর সৈন্যদলের হাতে এমন প্রহার খায় স্টোনী যে, তিনদিন লাগে তার জ্ঞান ফিরে আসতে। তারপর কোর্টে তাঁর ও লুকাসের বিচার হয়। বিচারে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় তাঁদের দুজনের। ১৭৯০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর আবার পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়ার সূত্রে পুনরায় দীর্ঘদিনের কারাবাস হয় স্টোনীর।

মেরী বাউজ তাঁর আতঙ্কিত অত্যাচারিত জীবন থেকে মুক্তি পান। ক্রমশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসে তাঁর জীবন। তারপর একদিন দীর্ঘ ছত্রিশ লাইনের একটি নিষ্ঠুর পদ্য লিখে তিনি কারাগারে বন্দী স্টোনীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

আর ১৮০০ সালে মৃত্যু হয় সেই গুণবতী রূপসী মেরী এ্যালেনার বাউজ-এর। ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে তাকে সমারোহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয় কবরের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নববধূর পোষাকটির সঙ্গে সেই নোংরা অশ্লীল স্বীকারোক্তিটিকেও মাটি চাপা দেওয়া হয়।

অবশেষে ১৮১০ সালে হতভাগা নিষ্ঠুর স্টোনীরও মৃত্যু হয় কারাগারে বন্দী অবস্থায়। শোনা যায়, মৃত্যুর মুহূর্তে স্টোনী নাকি শুভ্র পোশাক পরিহিত এক অশরীরীর ছায়া দেখতে পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে তাঁর পাংশুটে ফ্যাকাশে ওষ্ঠে এক অপরিসীম যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। তাঁকে ফিস্ ফিস্ করে বলতে শোনা যায়,

'আমাকে ক্ষমা করো, মেরী আমাকে ক্ষমা করো।'



# আমানুল্লার সিংহাসন

পরিশ্রমে তার শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাঁ হাতের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। আর প্রচণ্ড শীত। পোশাক পরিচ্ছদ ভেদ করে শীতটা গায়ে বিঁধছে। বরফের স্তূপে গজনী কাবুলের পথটা মুছে গেছে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে অশ্বারোহীটি তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে ছিলেন সামনের পথের দিকে। সমস্ত-ক্ষণ বরফ পড়ছে. তুষারপাত দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিয়ে চারপাশের পাহাড় পর্বত, বনস্থলী ঢেকে দিচ্ছে। অন্ধকার ঘন করে বোনা গাঢ় কুয়াশা। তবু অশ্বারোহীটি দূরে যেন ক্ষীণভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন রোলস রয়েস গাড়িটা বিদ্যুতের বেগে ছুটছে। ভাগ্য তখন সুপ্রসন্ন হয়েও হল না। হাত ছাড়া হয়ে গেল আরগাড়ির অমন সুবর্ণ সুযোগটা। বরফের স্তূপে আটকা পড়ে গিয়েছিল গাড়ীর চাকা, ঘণ্টা দুয়েক লেগে-ছিল বরফের স্তূপ খুঁড়ে চাকাটা বের করে আনতে। সেইমুহূর্তে ধরা যায়নি গাড়িটাকে। যাক্ যা হয়নি তার জন্য হাত কামড়ে

লাভ নেই। এখনও তিনি আশা ছাড়েন নি, তাই ধাওয়া করে চলেছেন।

সংবাদটা যদিও দেরি করে এসেছিল। আর কুড়িজন সঙ্গীসাথী নিয়ে তাঁকে ঘোরাপথে ছুটতে হচ্ছিল, তা না হলে অনেক আগেই তিনি গাড়ীটাকে ধরে ফেলতে পারতেন। এক পলকের জন্য গাড়ীর পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন সেই মানুষটিকে। পলায়নপর গদিচ্যুত বাদশা আমানুল্লাকে। কিম্ভুত মুখভঙ্গী বাদশার। কিন্তু পলকের মধ্যেই গাড়ীটা তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সঙ্গীসাথীরা এক-একবার চীৎকার করে উঠছিল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করছিল।

কখনও কখনও এই অশ্বারোহীর ভাবতে বেশ মজা লাগছিল, রাজধানী ছেড়ে বাদশা পালাচ্ছেন। দৃশ্যটা অদ্ভুত। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল কাবুলের কফিখানার সেই কথাবার্তাগুলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করছিলেন তিনি; কফিখানার দৃশ্যটা ও কথাবার্তাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি ছুটন্ত অবস্থাতেই ঘৃণায় শব্দ করে মাটিতে থুথু ফেললেন।

সেই ভয়ংকর রাত্রির কথাটা মনে পড়ছিল: সে রাত্রে কাবুল শহরের অধিবাসীদের চোখে নিদ্রা ছিল না, তারা আতঙ্কে, অস্বস্তিতে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন ধরে নানা দুঃসংবাদ শোনা যাচ্ছে। আর যেন সময় বুঝেই শীতের বাতাস বইতে শুরু করেছিল এবং বৃষ্টি পড়ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীসাথী নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন একসময়।

শহরে আমানুল্লার নিজস্ব দেহরক্ষী সৈনিক কলেজের কয়েকজন নাবালক ছাত্র ছিল মাত্র। বাদশার প্রধান ফৌজ তখন দক্ষিণে বিপ্লবী-দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছে। যদিও তার ইচ্ছা ছিল যুদ্ধটাকে আমানুল্লার কাছাকাছি নিয়ে আসতে কিন্তু তিনি শহরে ঢুকে বুঝতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর কোনো সুবিধা হবে না বরং শহরের অধিবাসীরা

তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, অথবা কাবুলের রাস্তা রক্তস্রোতে ভাসবে।' তিনি তাঁর দলবলকে সংযত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং শহরের সত্যিকারের অবস্থাটা দেখবার জন্য তিনি নিজে ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ভয়ার্ত ব্যবসায়ীরা নিরাপদ যায়গায় যাবার জন্য তাদের দামী মালপত্তর নিয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, মসজিদে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় আমানুল্লার দেহরক্ষী বাহিনীর লোকেরা টেলি-ফোন ও টেলিগ্রাফের ছেঁড়া তার মেরামত করবার কাজে লেগেছে, চতুর্দিকে কান্না আর ভয়ার্ত চীৎকার।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় তিনি দেখতে পেলেন বাজারের ভেতর একটা কফিখানা তখনও খোলা আছে। ভীষন পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকায় মুখ ঢেকে তিনি সেখানে ঢুকে পড়লেন। কফিখানাটা তখনও বেশ জমজমাট, অনেক লোকজন, তাজা গরম সবুজ চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে সবাই। তিনি কান পেতে তাদের আলোচনা শুনতে লাগলেন।

'এইসব মোল্লাদের ধরে ধরে হত্যা করার ব্যাপারটা কি তোমরা সমর্থন কর?'

'তোমার কী মনে হয় এই যে তাদের কামানের মুখে বেঁধে তোপ দাগা হচ্ছে, এটাও কি উচিত?'

'আরে বাবা, ওসব কথায় আমাদের কাজ কি, জানো তো দেওয়ালেরও কান আছে, কখন কে শুনে ফেলবে তারপরই কোতল হয়ে যাবে।'

'আমার তো মনে হয় ঐ বাচ্চাসাকোও মোল্লাদের মেরে ফেলবে।'

'আচ্ছা বাচ্চাসাকো কী আমানুল্লার হাত থেকে এই শহর কেড়ে নিতে পারবে?'

'বাচ্চাসাকোকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আমানুল্লার নেই।'

'যাই বলো আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা শেষ পর্যন্ত ঐ

ভিস্তিওয়ালার ছেলেটা আমাদের এই কাবুল শহরের বাদশা হয়ে বসেছে।'

এতক্ষন তিনি নীরবে ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। ওদের আলোচনায় মাঝে মাঝে বেশ মজাও পাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ উক্তিটিতে তাঁর শরীরের ভেতর যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা শব্দ করে পড়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোটখাটো সঙ্গীর দলটাও উঠে পড়ল। তিনি ঘরের ভিতর দিয়ে দূরের টেবিলটার দিকে হেঁটে যাবার সময় গা থেকে মোটা ভারী চামড়ার কোটটা খুলে মেঝের উপর পড়ে গেল, টের পেলেন না তিনি। সমস্ত শরীরটা জ্বলছিল তাঁর, চোখের দৃষ্টিতে আগুন। টেবিলটার সামনে গিয়ে চীৎকার করে উঠলেন,

'হ্যাঁ, একজন ভিস্তিওয়ালার ছেলে'

টেবিলের লোকেরা তাঁর চীৎকারে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁতে শব্দ করছিলেন।

'হ্যাঁ, একজন ভিস্তিওয়ালার ছেলে। কিন্তু তাকেই পাহাড়ের অধিবাসীরা বীর আর যোদ্ধা হিসাবে সম্মান করে। বাচ্চাসাকো একজন নগণ্য ভিস্তিওয়ালার ছেলে কিন্তু সে তোমাদের বাদশাকে অস্বীকার করবার, তার সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠবার স্পর্ধা রাখে।'

কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন তিনি আর তার চোখের সামনে থেকে জগৎ সংসার, সম্রাট, সিংহাসন সমস্ত কিছু মুছে যাচ্ছিল। কথা শেষ করে তিনি উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিলেন।

'বড্ড বেশী সাহস দেখছি যে তোমার। কিঞ্চিত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কে হে বাছা তুমি।'

একজন বলল আর তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের কয়েকজন জোর গলায় হেসে উঠল।

'আজ্ঞে আমি আপনাদের বান্দা বাচ্চাসাকো।' নাটুকে গলায় তিনি বেশ শান্ত ভাবেই কথা বললেন আর তাঁর ডান হাতের মুঠোয় ছুরির ফলাটা ঝলসে উঠল সেই সময়ে। 'আজ্ঞে আপনাদের ইচ্ছে হলে এই মুহূর্তে এই বান্দার মাথাটা কেটে ফেলে বা প্রাণটা কেড়ে নিয়ে বাদশার দেওয়া পুরস্কারটা নিয়ে নিতে পারেন।'

বাচ্চার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের মধ্যেই কফিখানায় স্তব্ধতা নেমে এলো। তিনি চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলেন কাঠপুতুলের মত মানুষগুলো সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন অদ্ভুত হাস্যকর হয়ে গেছে তারা। মুখের চেহারা ভয়ে বিস্ময়ে অদ্ভুত। তিনি গলা ছেড়ে সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে হা হা করে হেসে উঠলেন।

এতদিনেও বাচ্চাসাকো সেই কফিখানার ঘটনার কথা ভুলতে পারেন নি। অথচ তারপর এ-কদিনে কতসব উত্তেজক ঘটনা ঘটে গেছে তার চোখের সামনে দিয়ে। কফিখানা থেকে সঙ্গীসাথী নিয়ে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শহর ভরে একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। 'বাচ্চা....বাচ্চাসাকো।'

তারপর তিনি শহরের ভিতর লুকিয়ে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন—শ'য়ে শ'য়ে ভয়ার্ত মানুষেরা বাদশার প্রাসাদের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তারা প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে, কাঁদছে, বাদশার কাছে অস্ত্রশস্ত্র ভিক্ষা করছে, নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করবে, সরকারী সৈন্যের কোনো প্রয়োজন নেই তাদের।

কিন্তু আমানুল্লা প্রজাদের সেই চীৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন না কিংবা তিনি ইচ্ছে করেই তাদের উপেক্ষা করছিলেন। আসলে প্রাসাদের সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করা ছিল তখন।

প্রজাদের সঙ্গে বাদশার এ জাতীয় ব্যবহারই তিনি চেয়েছিলেন। প্রজারা আমানুল্লার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক। তিনি স্পষ্টই শুনতে পেলেন শহরের মানুষজন চেঁচিয়ে আমানুল্লাকে উদ্দেশ্য করে বলছে :

'শত্রু আমাদের শহরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। অমরা বাদশার কাছে সাহায্য চাইলাম তিনি চুপ করে রইলেন। এই কী সেই আমানুল্লা, যিনি পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলেন যে, তিনি প্রজাদের একজন সেবক।'

বাচ্চা রাস্তার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন আর হাসছিলেন মনে মনে: তিনি বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন (তাঁর কানে খবর এসে পৌঁছেছিল) আমানুল্লার মন্ত্রী মহম্মদ ওয়ালিও সুযোগ খুঁজছেন কী করে বাচ্চাসাকোকে দ্রুত ধ্বংস করা যায়।

পরদিন খুব ভোরবেলায় বাচ্চাসাকোর সৈন্যবাহিনী শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাদশার সৈন্যরাও প্রত্যুত্তরে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে কামানের গোলা ছুঁড়তে লাগল, শহর ভয়ংকর শব্দ আর ধোঁয়ায় ভরে গেল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাসাকো দেখতে পেলেন তাঁর প্রচুর সঙ্গীসাথী মারা গেছে। তিনি তবুও দমলেন না, চামড়ার পোশাক পরে দলবলের মধ্যে দিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তাদের উত্তেজনা সাহস ও মনোবল ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন আর যখন বুঝলেন তাঁর সঙ্গীসাথীদের মধ্যে আবার নতুন উদ্দীপনা জাগ্রত হয়েছে তখন তিনি অল্প কিছু সংখ্যক নিপুণ যোদ্ধা ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কাবুল শহরের প্রাচীরের কিছু দূরে হাবিবিয়া কলেজের ছাদের উপর উঠে সেখান থেকে নতুন আক্রমণ চালাতে লাগলেন বাদশার সৈন্যরা শত্রুপক্ষের এই নতুন আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। সেইদিন দলবলসহ আবার সেখান থেকে সরে গিয়ে বাগী-ই-বালায় নতুন শিবির স্থাপন করলেন বাচ্চা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়ে মধ্যরাত্রে বাচ্চা-সাকো আবার লুকিয়ে কাবুল শহরের ভেতর ঢুকে যুদ্ধের ফলাফলটা পর্যালোচনা করতে লাগলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কাবুল শহরের চেহারা আমুল পাল্টে গেছে।

ইতিমধ্যেই শহরের লোকেরা নিমলায় বাদশার ফৌজের পতনের সংবাদটা পেয়ে গেছে, তারা এটাও জেনে গেছে যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এইবার উত্তর ও দক্ষিণের বিপ্লবীদলও কাবুলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এদিকে বাচ্চাসাকোর দলবল ইতিমধ্যেই টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে সমস্ত সংবাদ আদান-প্রদানের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

বাচ্চা ঠিক করলেন পরদিন ভোরবেলায় বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের পথও বন্ধ করে দেবেন। সমস্ত শহরের পথে পথে ঘুরে তিনি দেখতে পেলেন মানুষজনের অসম্ভব ভয়ার্ত অবস্থা এবং তার সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গুজব তিনি শুনলেন ক্রমশ মানুষজনরা সসম্ভ্রমে বাচ্চাসাকোর নাম উচ্চারণ করছে, কেউ আর ভুল করেও তাকে ভিস্তিওয়ালার ছেলে বলে উল্লেখ করছে না। বরং বেশীর ভাগ লোকই বাচ্চাসাকোকে নতুন গাজী, মোল্লাদের মুক্তিদাতা ইত্যাদি বলেও ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চা এবার বাদশার সৈন্যদের শিবির আর্গে গেলেন। সেখানে পরিশ্রান্ত সৈন্যদল আগুনের কুণ্ডকে ঘিরে গা হাত পা এলিয়ে বসেছে। মুখ ঢেকে তিনিও তাদের ভিতর গিয়ে বসলেন। তাদের পরিশ্রান্ত মুখে তিনি যেন বাদশার প্রতি মন্ত্রীদের প্রতি আন্তরিক উষ্মার ছায়া দেখতে পেলেন। তিনি শুনলেন তারা বলাবলি করছে:

'যত সব হারামীর দল। দলে কুড়িজন সৈন্য থাকলে একশজনের মাইনে নেবে। তাতেও ওদের পেট ভরে না, মাস মাইনে দেবার কথা কুড়ি টাকা, কেটেকুটে দেবে চার টাকা।'

'এমন কথা কেউ শালা বাপের জন্মে শোনে নি।'

'প্রত্যেক মাসে আমি ব্যাটা গ্রামে পাঠাই তিনটে টাকা, হাতে থাকে এক, তা দিয়ে চালাও শালা সারা মাস।'

দুপুরের মধ্যেই অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। বাজারে দোকান-পত্তর, অফিস আদালত বন্ধ রইল, মানুষজন খাবার দাবার না পেয়ে

হইচই শুরু করে দিল। আমানুল্লা আর্গের নিরাপদ অবস্থায় বসে সৈন্যদল পাঠালেন জোর করে দোকানপত্তর খোলবার জন্য। অরাজকতার সুযোগে ততক্ষণে শহরের ভেতর লুটতরাজ, দাঙ্গা, আগুন ইত্যাদি শুরু হয়ে গিয়েছিল। শহরেব লোক শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে আমানুল্লার নির্দেশিত বিদেশী পোষাক পোড়াতে লাগল।

হয়ত বাদশা জনতার এই ক্রোধের সংবাদ জানলে ঘটনার গতি অন্যদিকে ঘুরে যেত। কিন্তু তাব পেয়ারের মন্ত্রীর দল তাঁকে এইসব সংবাদ জানতে দিল না।

আর সাবাদিন শহব পরিভ্রমণ করে সন্তুষ্ট হয়ে বাচ্চা আবার বাগ। ই-বালায় ফিরে এলেন। যদিও তখনও বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চল'ছল, তাব মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন বাদশা আমানুল্লার মিনতিপূর্ণ ইস্ত'হারের স বাদ ইস্তাহারে বলা হয়েছে, দেশের এই দুর্দিনে যে কেউ বাদশাকে সাহায্য করবে তাকেই তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রচুর গোলাবারুদ দেবেন।

এব পরদিন থেকেই কাবুল শহর ভবে গেল নানা জাতের লোক-জনে। তারা সবাই বাদশাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যেতে লাগল বাচ্চাসাকো এ-ব্যাপাবে কোনোরকম বাধা দিলেন না। বরং তার দলেব লোকজন ছদ্মবেশে গিয়ে প্রচুর পরিমানে ৩০৩ রাইফেল এবং গোলাবারুদ নিয়ে এলো।

আর ঠিক সময় বাচ্চা তাঁর লেফটেন্যান্ট সৈয়দ হুসেনকে পাঠালেন জুবল-আস-সিরাজ-এ সরকারী হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসটা নষ্ট করে দিয়ে আসবার জন্য। ফলে অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল।

এ ছাড়াও বাচ্চা আরো কিছু সঙ্গীসাথীকে পাঠালেন বাদশার বিমান বন্দরটি ধ্বংস করে আসবার জন্য। তারা কয়েকটি বিমানে আগুন ধরিয়ে দিল, নষ্ট করে দিল দামী সব যন্ত্রপাতি। এমনকি তারা সরকারী গ্যারেজে ঢুকে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক খালি করে জল ভরে

দিয়ে এলো। ফলে মোটর গাড়িগুলো সব অকর্মণ্য হয়ে পড়ে রইল গ্যারেজে।

ক্রমশ আমানুল্লার সময় ফুরিয়ে আসছিল। সন্ধ্যার সময় বেগম এবং প্রাসাদের অন্যান্য আশ্রিত আত্মীয়স্বজন, গয়নার বাক্স, কোষাগারের অবশিষ্ট সোনা নিয়ে একটা বিমান কান্দাহারের দিকে উড়ে গেল।

এবং অবশেষে আমানুল্লা আর্গের এক অন্ধকার ঘরে তার ভাই সর্দার ইনায়েতুল্লা খানের পাশে এসে বসলেন। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই ভাই-এর হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে দলিলে সই করলেন। ঘরে আলো জ্বালাতেও তাঁর তখন ভয় করছিল। তারপর অত্যন্ত নিঃশব্দেই তিনি রোলস রয়েসে চড়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে গেলেন।

সমস্ত ঘটনাগুলো এক এক করে মনে পড়ে যাচ্ছিল বাচ্চাসাকোর, আর তিনি নীরবে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে বাদশাকে অনুসরণ করে চলেছিলেন কিন্তু আর পারছিলেন না। সমস্ত শরীরটা তাঁর ঝিম ঝিম করছিল। হাতের মুঠোটা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। সৈয়দ হুসেনকে ডেকে দলের ভার দিয়ে একজন মাত্র দেহরক্ষী নিয়ে তিনি ফিরে চললেন শিবিরের দিকে। এই মুহূর্তে তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

ফেরবার পথে অবসন্ন শরীরেও কিন্তু তিনি ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিলেন না। বাচ্চাসাকো যেন কেবলই কানের কাছে সেই মোল্লার ভবিষ্যৎ বাণীটা শুনতে পাচ্ছিলেন, 'বাদশা, বাচ্চাসাকো, তুমি কাবুলের বাদশার আসনে বসবে।' সেই সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনের দিনগুলোকেও মনে পড়ছিল। সেই প্রথম দিককার সৈনিক জীবন, সেই ১৯২৫ সালে কাবুলে ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রথম বাদশা আমানুল্লাকে ও বেগম সুরাইয়াকে দর্শন। সৈনিক ব্যারাকের সেই ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনের কথাও মনে পড়ছিল তাঁর। তারপর সেই মেজর সাহেব, বাচ্চাসাকোর হাতে কা নাজেহালই না হয়েছিলেন তিনি।

উচ্চপদস্থ অফিসারের গালে চড় মারার জন্য বাচ্চাসাকোর সেই বন্দিত্ব, তারপর বন্ধু জামালের সহায়তায় একরাত্রে কারাগার থেকে পলায়ন। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় মেজর সাহেবের পোশাক পরিচ্ছদ খুলে ন্যংটো করে দিয়ে শহরের লোকের চোখে তাঁকে হেয় দিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যাওয়া। না, কোনো ঘটনাই তিনি ভুলে যান নি। কুয়াশায় অন্ধকারে শীতে শরীরের অসহ্য কষ্টের মধ্যেও ছুটন্ত অবস্থায় তাঁর সব মনে পড়ছিল।

এমন কি প্রথম দিনের একজন মাত্র সঙ্গী সম্বল করে লুঠ করে আনা সেই চারটে উটের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। কী আশ্চর্য্য নরম স্বভাবের ঐ প্রাণীগুলো। প্রথম দিনের সেই চারটে লুঠ করে আনা উট দিয়েই তো তাঁর সত্যিকারের জীবনের শুরু। সেই থেকেই তো খোহিস্তানের লোকের চোখে তাঁর সম্মান বাড়ল। আগে তো কেউ পাত্তাই দিত না তেমন, বরং উপেক্ষার চোখে দেখত। তারপর যতই একটি দুটি করে দলে লোক বাড়তে লাগল আর ততই বাচ্চা-সাকোর নাম ছড়াতে লাগল দেশ ভরে। তিনি হেঁটে গেলে পথের দুধারে গুঞ্জন উঠত, 'বাদশা....বাদশা।'

সেই অখণ্ড প্রতাপশালী শত্রু সারফুদ্দিনের ঘটনাটা মনে পড়ল বাচ্চার। সেই 'গিরিখাতের সম্রাট' কিছুতেই বাচ্চাসাকোর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন নি। ফলে তাঁর আর শান্তি ছিল না। তারপর সেই একশজন সহচর নিয়ে একরাত্রে সারফুদ্দিনের গ্রাম আক্রমন করে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার উত্তেজনা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি।

এরপর জীবনটা নিরুপদ্রব হয়ে এসেছিল ক্রমশঃ। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গিরিখাতের কর আদায় করেই বেশ চলে যাচ্ছিল সচ্ছন্দে। কিন্তু তাতে কী তাঁর শান্তি ছিল? তখন মাত্র দস্যুদলের সর্দার তিনি। প্রতিনিয়ত তখন তাঁর কানে বাজত সেই মোল্লার ভবিষ্যৎবাণীটা 'বাদশা, বাচ্চাসাকো তুমি কাবুলের বাদশার আসনে বসবে।' অতএব তিনি

আর কোনো সম্মানে উৎফুল্ল হতে পারছিলেন না। তখন কেবল কান ও চোখ সজাগ রেখে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলেন।

দেশের চারিপাশে তখন অশান্তির ঝড় বইছে। ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে আঠারো হাজার মুসলমান দেশত্যাগ করে আফগানিস্থানে এসে বসবাস শুরু করেছিল। ফলে তাদর সঙ্গে বাদশা ও স্থানীয় অধিবাসীদের ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। অন্যদিকে বাদশা আমানুল্লা নিত্য নতুন দেশ গঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। মোল্লাদের নিষেধ না মেনে গ্রামে শহরে বিদেশী প্রথায় নতুন নতুন স্কুল খোলা হয়েছিল, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, নিত্য নতুন কর বসেছিল। বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় ঘুগানিস্, আফ্রিদিস্, কুনারস্, সিনওয়ারিস্‌দের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সূত্রপাত হয়েছিল এবং ১৯২৮ সালে বিদেশ প্রত্যাগত বাদশা জাতীয় পোষাক ত্যাগ করে বিদেশী পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানের আইন ও পর্দা প্রথা উঠিয়ে দেবার সরকারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

দেশের এ জাতীয় পরিস্থিতির সুযোগ বাচ্চাসাকো যথাযতভাবই কাজে লাগিয়েছিলেন। সঙ্গীসাথী নিয়ে বাদশার ফৌজ আক্রমন করে-ছিলেন। এবং ক্রমশঃ রাজধানীব দিকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে গিয়ে-ছিলেন। তারপর কত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে বাদশা আমানুল্লার পতন অনিবার্য করে এনেছিলন। অবশেষে ভাই-এর হাতে রাজ্য অর্পণ করে বাদশাকে রাজ্যত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন।

নিজের সমস্ত জীবনের ঘনটাগুলোকে বাচ্চাসাকো টুকরো টুকরো ভাবে মনে করতে পারছিলেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর শরীরটা যেন শূন্য হয়ে গেছে, তিনি আর ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পারছেন না। তাঁর যেন মনে হচ্ছিল শীতের প্রকোপে তাঁর শরীরের সমস্ত রক্তবিন্দু জমাট বেঁধে গেছে। একটা প্রচণ্ড শীতলতা তাঁর মেরুদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত করে শীতল করে দিচ্ছে। চোখের সামনে থেকে সবকিছু যেন মুছে যাচ্ছে। নিবিড় কুয়াশায় সম্মুখের প্রান্তর

ঝাঁপসা হয়ে আছে, পথ ঘাট শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। অসহ্য কষ্টে ও যন্ত্রণায় বাচ্চাসাকো ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে মৃতের মত পড়ে থাকলেন।

তারপর কয়কদিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়ে জ্ঞান ফিরে এলে শুনতে পেলেন ইনায়েতুল্লা রাজ্যের কর্মভার গ্রহণ করে আর্গে জনতার সম্মুখে শপথ গ্রহণ করেছেন। সংবাদ শুনে তিনি হেসে ফেললেন। ক্ষীণভাবে তারপর সৈয়দ হুসেনের হাতে একটা চিঠি লিখে নতুন বাদশার কাছে পাঠালেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন, নতুন বাদশা হয় তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করুন নচেৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইনায়েতুল্লা উত্তর দিলেন না, ফলে তিনি তাঁর সৈন্যসামন্তকে রাজধানীর দিকে পুনরায় অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। তাঁর সৈন্যসামন্ত সৈয়দ হুসেনের নেতৃত্বে যখন আর্গে গিয়ে পৌঁছুল তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দেখতে পেলো রাজা-প্রাসাদের মাথার উপর একটা সাদা পতাকা উড়ছে। অতএব বড় দ্রুতই শেষ হয়ে গেল নতুন বাদশার জীবন। ইনায়েতুল্লা দলিলে সই করে বাচ্চাসাকোকে বাদশা হিসাবে মেনে নিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেলেন।



# পুরুষ

আশি বছরের দীর্ঘ, সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধটি দীপ্ত ঋজু ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে একবার দেখলেন চারপাশ। হাজারে হাজারে লোক দাঁড়িয়ে আছে চার পাশে। এত অসংখ্য মানুষ বুঝি ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। সকলে শান্ত, স্তব্ধ। তিনি একবাব আকাশের দিকে মুখ তুলে ধরলেন কিছু সময় তাঁর মুখ ঊর্ধ্বের নীলিমাব দিকে স্থির হয়ে রইল. মুখটা তিনি যখন আবার নামিয়ে আনলেন তখন সকলে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল তাঁর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি জ্বলে উঠেছে। তিনি আর কোনোদিকে তাকালেন না, ফাঁসি মঞ্চেব দিকে এগিয়ে চললেন হাসিটা কিন্তু লেগে রইল তাঁর ঠোঁটে।

ধীর পদক্ষেপে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন ফাঁসি মঞ্চের সিঁড়ির নীচু ধাপে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁকে তখন কেমন অসহায় দেখাল। সিঁড়ির ধাপে একবার পা বাড়িয়ে আবার তুলে নিলেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বুঝি একবার হাত বাড়িয়ে খুঁজলেন পাশের কোনো সঙ্গীকে।

চারপাশের নীরব জনতার দিকে একবার তাকাতে গেলেন, বড় ক্লান্ত দেখাল তাঁকে। চাপা বিষণ্ণ গলায় একবার দু'পাশের সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তাকে ডেকে বললেন,

'সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না, দুজন সঙ্গী দিন আমাকে হাতে ধরে তুলবে।'

বিষণ্ণ গলায় কথা শেষ করে তিনি ম্লান একটু হাসলেন। তারপর দুজন সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে ফাঁসীর মঞ্চের উঁচু উঁচু সিঁড়িগুলোর উপর পা দিলেন। সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন দুর্বল পায়ে। কিছুদূর উঠে হাঁফ ধরল। দু-এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিতে হল তাঁকে। তারপর সবচেয়ে উঁচু পাটাতনটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে কোনোরকমে সামলে নিলেন। বিষণ্ণতাটা কেটে গিয়ে একটু একটু করে আবার উজ্জ্বলতাটা ফুটে উঠতে লাগল তাঁর চোখে মুখে। এই সময় তিনি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা আবার ভাল করে দেখলেন। তারপর আচমকাই গম্ভীর গলায় সকলকে শুনিয়ে প্রায় চীৎকাব করে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ বেশ, একজন বৃদ্ধ মানুষেব ফাঁসী দেখবার জন্য এত সমারোহ, এত লোকজন' কথাব সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটা কুঁচকে গেল তাঁর, ঘৃণায় মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল। 'এসব দেখে শুনে মনুষ্য জাতির উপরই ঘৃণা হয়।'

তার গম্ভীর গলাটা শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে গমগম করে উঠল। তিনি কয়েক পলক যেন কোনো একটা উত্তর শোনবার আশায় উৎকর্ণ হয়ে রইলেন, অবশেষে হাঁটু ভেঙে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন পাটাতনটার উপর। দুহাত বাড়িয়ে দিলেন শূন্যে। তারপর কিছু সময় নীরব হয়ে থেকে ল্যাটিন ভাষায় নাটুকে গলায় ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সত্যিই আনন্দের।'

কথাটা শেষ করে রাজকীয় কায়দায় নিজের গলাটা পেতে দিলেন জহ্লাদের কুঠারের তলায়।

১৭৪৭ সালে ইংলণ্ডে ৯ই এপ্রিলের সকালটা এই রকম একটা

দৃশ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেদিন দুর্ধর্ষ চরিত্রের সিমন ক্রিস্টোফার জোসেফ ফ্রেসারকে অর্থাৎ ১১নং লর্ড লোভাটকে লণ্ডন টাওয়ারে ফাঁসি দেবার জন্যে আনা হয়েছিল। আর সেদিন লণ্ডনের সমস্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা ভিড় করে এই অসম্ভব মানুষটির ফাঁসি দেখতে এসেছিল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সেদিন এই অসংখ্য গল্প-কাহিনীর নায়ক সিমন ফ্রেসারকে প্রাণভরে দেখে নিয়েছিল। এমন দুর্ধর্ষ চরিত্র উপন্যাসের পাতায়ও বুঝি দুর্লভ।

একদা এই দীর্ঘ, সরল ও আশ্চর্য রূপবান পুরুষটিকে নিয়ে ইংলণ্ডের উঁচুতলার সমাজে অশান্তি আর উদ্বেগের বুঝি শেষ ছিল না। তাদের অশান্তির কারণ সিমন ফ্রেসারের স্ত্রী-শিকারের ঘটা নিয়ে। বলা যায় না কখন কোন কুমারী বা বয়স্কা রমণী তাঁর চিত্ত হরণ করবেন, আর সিমন ফ্রেসার সদলবলে প্রাসাদে হানা দিয়ে লুঠ করে নিয়ে যাবেন তাঁদের। শৌর্যেবীর্যে যদি না হয় তাহলে তো ছল চাতুরি আছে। অতএব উঁচু সমাজের কোনো কুমারী বা বৃদ্ধাও তাঁর ভয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারতেন না।

বিশেষতঃ লেডি লোভাটের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার তাঁকে সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে কুখ্যাত চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঘটনাটা ছিল যেমন অসম্ভব তেমন অস্বাভাবিক। লেডি লোভাটের একমাত্র কন্যা প্রিমরোজ কম্প্‌বেলের প্রতি দীর্ঘকাল ধরেই মোহমুগ্ধ ছিলেন তিরিশ বছরের সিমন ফ্রেসার। প্রিমরোজের সৌন্দর্য ছাড়াও তাঁর প্রতি সিমনের অনুরাগের অন্য একটি ব্যবসায়িক কারণও ছিল। লোভাট খেতাবের উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রিমরোজ। আর লেডি লোভাট দীর্ঘদিন চেষ্টা করেছিলেন কন্যার একটি যোগ্যপাত্রে বিয়ে দেবার। তাঁর মনোমত একটি পাত্রও পাওয়া গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। খুব দ্রুত সিমনের হাত থেকে কন্যাকে বাঁচানোর চেষ্টায় লেডি লোভাট উচ্চবংশের রূপবান গুণবান সেই স্কট যুবকটির সঙ্গে অত্যন্ত গোপনে বিয়ের ব্যবস্থা সব পাকাপাকি করে ফেললেন। কারণ ঐ সিমন ফ্রেসার নামক

যুবকটিকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। বড় দাম্ভিক আর বিশ্রী মনে হত যুবকটির স্বভাব, চালচলন। কিন্তু আশ্চর্য, যথাসময়ে বিয়ের খবর গিয়ে পৌঁছুলো সিমনের কানে। তিনি তো এ সংবাদে প্রমাদ গুনলেন। অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে হোক প্রিমরোজের, না হয় লোভাট টাইটেলের মায়াও ত্যাগ করা গেল, কিন্তু প্রিমরোজের বিয়ের ফলে তাঁদের ঐ বিপুল সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ফ্রেসার পরিবারের বন্দকী সম্পত্তিটাও অপরের হাতে চলে যাবে। অতএব কিছুতেই আর সিমন ঠিক থাকতে পারলেন না। তাঁর দলবলের তিনশ'জন লোক নিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন লেডি লোভাটের প্রাসাদ ডাউনির দিকে। যে করেই হোক বিয়েটা বন্ধ করতে হবে, আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে আসতে হবে ঐ ডাউনি প্রাসাদের লোকজনদের। ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে চলতে প্রতিজ্ঞাটা একবার ঝলসে উঠল সিমন ফ্রেসারের মনে।

প্রাসাদে পৌঁছতে পৌঁছতে সিমনের সন্ধ্যা হয়ে হয়ে গেল। গিয়ে দেখলেন প্রাসাদ খালি, প্রিমরোজ অন্যত্র চালান হয়ে গেছে। খালি প্রাসাদে কেবল মাত্র লেডি লোভাট।

তাব্র রাগে হতাশায় সিমনের সর্ব শরীর জ্বলে উঠল। রক্তের ভিতর এক উন্মাদ কল্লোল অনুভব করলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তেই নতুন এক ফন্দি এলো তার মনে। না হয় হাতছাড়া হোক প্রিমরোজ কিন্তু এ বয়স্কা বিধবা রমণীটি তো আছেন। তাঁকেই বিবাহ করবেন সিমন ফ্রেসার। আর যতদিন লেডি লোভাট জীবিত আছেন ততদিন সম্পত্তি বা পারিবারিক খেতাব প্রিমরোজের প্রাপ্য নয়। অতএব লেডি লোভাটকে বিবাহ করার অর্থ সম্পত্তি ও খেতাব লাভ। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দিলেন তিনি। প্রাসাদের চৌহদ্দি ঘিরে ফেললেন দলবল দিয়ে। সঙ্গীরা সব অন্ধকারে ছায়ার মত মিশে দাঁড়িয়ে রইল। আর তিনি পার্শ্বচর কয়েক জনকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন। প্রাসাদরক্ষীরা প্রথমে বাধা দিল প্রাণপণে কিন্তু পরে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে

গেল। বিজয়ীর মত প্রাসাদে ঢুকলেন সিমন ফ্রেসার। প্রাসাদের সব ঘর ঘুরে ঘুরে লেডি লোভাটের শয়ন কক্ষে গিয়ে হাজির হলেন। সিমনের সঙ্গী সাথীদের চিৎকার হই হল্লার সাড়া অনেক আগেই কানে পৌঁছেছিল লেডি লোভাটের। উত্তেজনায়, ভয়ে তাঁর দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা আরো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি, শয়নকক্ষে বিছানায় এলিয়ে পড়েছিলেন। প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত বলে মনে হয়েছিল তার ঐ ঘরটাক। মনে হয়েছিল যতই দুর্বিনীত দুর্ধর্ষ হোক সিমন ফ্রেসার কিন্তু আসলে তো উচ্চবংশের সন্তান। খুব সহজে কোনো ভদ্রমহিলার শয়নকক্ষে ঢুকতে তার নিশ্চিত চক্ষুলজ্জায় বাঁধবে। অন্তত ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যাবেন বিফল হয়ে, কিন্তু সিমনের তখন মরিয়া অবস্থা, কোনো ভদ্রতা-বোধ, চক্ষুলজ্জা তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারছিল না। এক মুহূর্ত শয়নকক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, একটু ইতস্তত করেছিলেন, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বার দুয়েক টোকা দিয়েছিলেন দরজায় কিন্তু ভেতর থেকে কোনো রকম সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিয়েই খুলে ফেলে-ছিলেন সেই দরজা।

আর লেডি লোভাট খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কয়েক মুহূর্ত। আশ্চর্য, খোলা দরজার চৌকাটে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছেন সিমন ফ্রেসার, চোখের দৃষ্টিটা চকচকে। বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে অত্যন্ত মৃদু সুরেলা গলায় কথা বললেন লেডি লোভাট—'কী চাই।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে ঘরের ভিতর তাঁর বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন সিমন ফ্রেসার। তারপর বললেন, 'তেমন বিশেষ কিছু না, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'

কথাটা যেন ভাল করে বুঝে উঠতে পারলেন না লেডি লোভাট। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বললে ?'

'আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। সত্যি বিশ্বাস করুন। আর আমাদের বিয়েটা আজ রাত্রেই হবে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই।' অত্যন্ত স্বাভাবিক, নির্বিকার গলায় কথা বললেন সিমন ফ্রেসার।

লেডি লোভাটের মনে হল বায়ুর চাপে তাঁর কানের ভেতরের পর্দাটি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর তাঁর লজ্জায় ঘৃণায় রি রি করে উঠল। তিনি চোখের পাতাটা বন্ধ করে ফেললেন। আর মুহূর্তের মধ্যেই আবার সেই, দুর্বিনীত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন আপনি। আমি আশা করব এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি আপনার সাজসজ্জা সব সেরে নেবেন।'

না চোখের পাতা দুটো আর বন্ধ করে রাখতে পারলেন না লেডি লোভাট। রাগে তাঁর সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। তিনি চোখ খুলে দেখলেন হাস্যোজ্জ্বল মুখে তেমনি দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যুবকটি।

নিজেকে যথা সম্ভব সংযত রেখেই কথা বললেন তিনি,

'তুমি নিশ্চয়ই কী বলছ তার অর্থ ভালো করে জানো না।'

'সব কিছু ভেবে চিন্তেই কথা বলছি আমি।' আশ্চর্য-মোহময় হাসি দিয়ে কথা শেষ করলেন সিমন।

'তুমি ঠিক বলছ না, একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে, একজন বয়স্কা বিধবা ভদ্রমহিলাকে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে ঐ ধরনের নোংরা প্রস্তাব করা তোমার উচিত হচ্ছে না।'

'দেখুন বেশি কথা বলা আমি তেমন পছন্দ করি না আমি আগে যা বলেছি এখনও তা বলছি, এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি বিয়ের সাজসজ্জা করে নিন।' কথাটা শেষ করেই সিমন দরজার দিকে ফিরলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এতক্ষণ বিছানার দুপাশে কাঠপুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা দাসী চারজনের গলার আওয়াজ শুনলেন, 'উঃ কী ভয়ানক।'

চাপা গলায় উত্তেজিতভাবে তারা এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বলে উঠতেই এতক্ষণে তাদের দিকে দৃষ্টি গেল তাঁর। ফলে

সিমন তাঁর সঙ্গীদের ডেকে হুকুম দিলেন, 'দাসী চারজনকে ঘর থেকে বের করে দাও।'

বলেই আর সেখানে দাঁড়ালেন না, পাশের ঘরের একটা সোফায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলেন সিমন। বেশ দারুন একটা নাটক অভিনয় করা হল এতক্ষণ। এবার কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও বিরতি। গলা ফাটিয়ে একবার হেসে উঠতে ইচ্ছে হল তাঁর। সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে প্রিয় একটা গানের কলি মনে পড়ল। সুরটা শিস দিয়ে বাজিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, এখনও অনেক কাজ বাকী। একজন পাদ্রী ডাকতে হবে, অন্য সব কিছুর যোগাড়যন্ত্র করতে হবে। না, শুয়ে বসে দিন কাটালে চলবে না। ছটফটে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সিমন ফ্রেসার। বারান্দার দেওয়ালে একটা ঝোলানো আয়না চোখে পড়ল। একমুহূর্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখে নিলেন। এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। মানসিক উত্তেজনায় মুখের চেহারাটা ভীষণ লালচে দেখাচ্ছে, যেন খুব কষে মুখে গোলাপী পাউডার ঘষা হয়েছে। পাকা একজন অভিনেতার রঙ করা মুখের মত দেখাচ্ছে অনেকটা। তিনি আর এক মুহূর্ত আয়নার সামনে সময় নষ্ট না করে সাঙ্গোপাঙ্গোদের কাজের কথা বুঝিয়ে দিতে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আর লেডি লোভাট শুনতে পেলেন ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করার শব্দ। হতাশায়, অবসাদে শরীরটা কেমন ভারী ভারী লাগতে লাগল। কিছুতেই ভাবতে পারছেন না তিনি। মথার ভেতর সমস্ত চিন্তা ভাবনা গুলো কেমন এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ছিল, নিজের যৌবনের কথা, বাপ মার কথা, প্রিমরোজের কথাটাও ভুলতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় কী করবেন তিনি, কী করতে পারেন। ঘরে একজন সঙ্গীসাথী থাকলেও আলাপ-আলোচনা করা যেতো। কিন্তু ফাঁকা ঘরে একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর কোনো কথা ভালো করে মনে পড়ছিল না।

নতজানু হয়ে ঐ দুবৃত্তটার কাছ থেকে নিজের ও পরিবারের সম্মান ভিক্ষা চাইবেন ? বিছানায় বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেন না, ছটফটে পায়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মত এমন অসম্ভব অবস্থায় আর কেউ কোনোদিন পড়েছিল কিনা তিনি মনে করতে পারছিলেন না ভালো করে। এই অসম্মানের চেয়ে এই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি তৃপ্তিতে চোখ বুঝতে পারতেন। অসহ্য মনোকষ্ট, চিন্তায় ভাবনায় তাঁর অবস্থাটা যখন উন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন তিনি শুনতে পেলেন বন্ধ দরজায় চাবি খোলার শব্দ। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ঘরের ভারী দরজাটা খুলে গেল। লেডি লোভাট দেখতে পেলেন ধীরে ধীরে পা ফেলে দরজা দিয়ে সিমন ফ্রেসার ঢুকছেন। আগের মতই তেমনি হাস্যোজ্জ্বল মুখ, দাম্ভিক পদক্ষেপ আর চোখের দৃষ্টিতে সেই ছুরির ফলার ধার। লেডি লোভাট আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, নতজানু হয়ে মেঝের উপর বসে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'দয়া করুন, সিমন ফ্রেসার। আমাকে দয়া করুন আপনি।'

অবিরল কান্নায় তাঁর গলার স্বর ঝাপসা হয়ে এলো তাঁর দুই গাল ধুয়ে গেল। এক মুহূর্ত যেন সিমন ফ্রেসার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সিমন দুটো হাত বাড়িয়ে সেই বয়স্ক রমণীর কাঁপা মসৃণ হাতদুটো ধরে মেঝে থেকে তাঁকে তুলে আনতে আনতে গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন লেডি লোভাট, আমাকে বিয়ে করা ছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই। আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন, সানন্দে রাজী হয়ে যান, দেখবেন আমার মত বাধ্য প্রেমিক স্বামী আপনি আর কোনোদিন দেখেন নি।'

সিমনের কথাগুলো কান পেতে আর শুনতে পারলেন না লেডি লোভাট, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের কান দুটো চেপে ধরলেন, তারপর উন্মত্তের মত মাথা নাড়তে লাগলেন, 'না, না, এ হয় না সিমন ফ্রেসার, এ কিছুতেই হতে পারে না।'

মুহূর্তের মধ্যে সিমন ফ্রেসারের চোখের দৃষ্টিটা জ্বলে উঠল, 'হতে

পারেনা মানে, আমি যখন বলছি, এ বিয়ে হবেই।' কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠলেন।

'না, না, এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না।' আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলেন লেডি লোভাট।

সিমন ফ্রেসার তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে একজন সঙ্গীকে পাদ্রী মিঃ মুনরোকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেডি লোভাট আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন ভয়ে কাঁপতে থাকা হাত বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধ পাদ্রী মিঃ মুনরোকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসা হল। সিমন তাকে দেখে বেশ উৎফুল্ল গলায় বলে উঠলেন,

'বাঃ, বাঃ, এই তো বেশ মনোমত পুরোহিত। তা মিঃ মুনরো, আর বেশী দেরী না করে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থাটা করুন।'

বৃদ্ধ পাদ্রীটি একবার অসহায় চোখে লেডি লোভাটের দিকে তাকালেন, কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পিঠের কাছে একটা ধারাল ছুরির স্পর্শ পেয়ে চকিতে শিউরে উঠে পাত্র-পাত্রীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলেন। বেশ উৎফুল্ল গলায় পাদ্রীর নির্দেশ মত কথা বললেন সিমন ফ্রেসার, আর স্তম্ভিত হয়ে নীরব হয়ে রইলেন লেডি লোভাট। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টিটা যেন অন্ধ হয়ে রইল। তিনি চোখ দিয়ে যেন কিছু দেখলেন না, কান দিয়ে যেন কিছু শুনলেন না। তাঁর যেন কেবল মনে হতে লাগল তিনি যেন এই মুহূর্তে প্রস্তরে পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। জীবনের সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই। তিনি অন্য রাজ্যের অধিবাসী। এই অবস্থাটা বেশীক্ষণ থাকল না তার, অন্তত সিমন ফ্রেসারের আনন্দিত কণ্ঠস্বর তাঁক আবার মর্তভূমিতে ফিরিয়ে আনল। তিনি শুনতে পেলেন সিমন তাঁকে লক্ষ করে বলছে 'মন্ত্রটা না হয় নাইবা আওড়ালে কিন্তু তাতে কী বিয়েটা বাতিল হয়ে যাবে।' কথাটা শেষ করে সিমন হাত বাড়িয়ে দিল লেডি লোভাটের

দিকে, আর কী যেন হল তাঁর, একটা আর্ত চীৎকার করে তিনি ঘরের মেঝেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

'দাসীদের ডাকো,' একজন পার্শ্বচরকে নির্দেশ দিয়েই সিমন ফ্রেসার মেঝেতে হাঁটু-ভেঙে বসলেন, তারপর পালক পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে লাগলেন লেডি লোভাটের নাকে। রাত দুটো নাগাদ জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। সিমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দাসীদের হুকুম দিলেন,

'ঘুমুতে যাবার পোষাক পরিয়ে দাও এঁকে, বিছানাটা ঠিক করে দাও।'

আশ্চর্য চারজন দাসীর একজনও এগিয়ে গেল না সিমনের হুকুম তামিল করববার জন্য। ঘাড়গুঁজে তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের চোখকে যেন প্রথম বিশ্বাস করতে পারলেন না সিমন ফ্রেসার, তারপর ঘটনাটা বুঝতে পেরে গলা খুলে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে পর সিমন তাঁর সঙ্গীসাথীদেরই নির্দেশ দিলেন লেডি লোভাটের পোষাক পরিবর্তন করার। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা যায়, সিমন ফ্রেসারের নির্দেশ পেয়ে তাঁর সঙ্গীসাথী যুবকশ্রেণী এত ঘাবড়ে যায় যে তারা প্রথম লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে পরে লেডি লোভাটের পোষাকের বোঝা নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। তারা কিছুতেই ঐ পোষাকের বোঝার ভিতর থেকে লেডি লোভাটের সুন্দর সচ্ছন্দ শরীরটাকে খুঁজে বের করতে না পেরে হতাশ হয়ে ছুরি দিয়ে পোষাকটা কাটতে শুরু করে। ফলে অচৈতন্য লেডি লোভাটেব শরীরের জায়গায় জায়গায় ছুরির ফলার আঁচড় লাগে, কেটে গিয়ে রক্ত বেরোয়। তারপর কাপড়ের স্তূপ থেকে কোনো রকমে লেডি লোভাটের শরীরটিকে আবিষ্কার করে তারা জোর করে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেয়; পরে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে দাসী চারজনকেও হত্যা করে। সারারাত্রি ধরে তারপর লেডি লোভাটের চীৎকার চাপা দেবার জন্য বসার ঘরের বাগানে উচ্চৈঃস্বরে বাজনা বাজে। বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায় সেই বাজনার শব্দ। আর বড় দ্রুত সিমন ফ্রেসারের এই বিবাহ ও পাশবিক

অত্যাচারের কাহিনী সমস্ত ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানী থেকে তাঁকে ধরবার জন্য সৈন্যবাহিনী আসছে খবর পেয়ে সিমন পালিয়ে যান পাহাড়ে। তাঁর অনুপস্থিতেই তাঁর বিচার শেষ হয়। কিন্তু আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে এক গোপণ বৈঠকে দেখা করে মুক্তি পেয়ে যান সিমন ফ্রেসার। তারপর থেকে সিমন আরো দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠেন। একজন স্পেনীয় সুন্দরীর জন্য কয়েক বছর ধরে ডিউক অফ ওয়ারটনের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য যুদ্ধ চলে। জীবনে মাত্র বছর কয়েক তিনি সুস্থভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন শোনা যায়। তাও লেডি লোভাটের মৃত্যুর পর লুডোভিক গ্র্যান্টের কন্যা মার্গারেটকে বিয়ে করবার পর। খুব অল্প বয়সেই চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই মার্গারেটের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর মাস ছয়েকের মধ্যেই আবার আটষট্টি বছরের সিমন ফ্রেসারের নারী শিকারের বাসনা জেগে ওঠে।

এবার একটি বিবাহে অনিচ্ছুক যুবতীকে নিজের পত্নী করার বাসনায় সিমন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন। যুবতীটি হলেন প্রিমরোজ ক্যাম্পবেল, বিখ্যাত জন ক্যাম্পবেলের বোন। সেই আশ্চর্য রূপবতী তরুণীটিকে বার বার বিবাহের প্রস্তাব করে ব্যর্থ হয়ে সিমন ক্ষিপ্ত হয়ে যান। এবার আর কন্যাকে লুঠ করে আনা চলবে না, ছল-চাতুরিতে কাজ সারতে হবে। মনে মনে চিন্তা করে সিমন ফ্রেসার সুযোগ সন্ধান করেও বেড়ান। আর আশ্চর্য অত্যন্ত ভালো একটা সুযোগও জুটে যায় তাঁর হঠাৎ। তিনি খবর পান, প্রিমরোজ শহর থেকে কয়েক দিনের জন্য গ্রামে এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। অতএব সিমন তৎপর হয়ে ওঠেন।

একদিন ভোরে আত্মীয়ের গ্রামের বাড়িতে প্রিমরোজ তাঁর মার হাতের লেখা একটা চিঠি পান। চিঠিতে লেখা ছিল, এডিনবারায় এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রিমরোজের মা, কন্যাকে একবার দেখতে চান। প্রিমরোজ আর দ্বিরুক্তি

না করে এডিনবারার সেই রহস্যময় অচেনা প্রাসাদে গিয়ে হাজির হন তার পরদিনই। প্রথম কয়েক মুহূর্ত প্রিমরোজের প্রাসাদটিকে একটা ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়, কিন্তু পরে বড় মনোরম আর নির্জন লাগে জায়গাটা। সদর দরজায় দাস দাসীরা অপেক্ষা করছিল—তার বিনা বাক্যব্যয়ে প্রিমরোজ ক্যাম্পবেলকে দোতালার একটি শয়নকক্ষ দেখিয়ে দিল। দোতলায় উঠে নির্দিষ্ট শয়নকক্ষের দরজাটা খুলে প্রিমরোজ অবাক হয়ে গেলেন। নির্জন ঘর, বিছানাটি শূন্য। ঘরের চারপাশে তাকালেন প্রিমরোজ কিন্তু কোনো মানুষ জন দেখতে পেলেন না। আর সেই বিস্মিত মুহূর্তে তিনি যেন টের পেলেন কে যেন আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে। চকিতে ঘুরে দরজার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রিমরোজ। বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে একজন দীর্ঘ সবল রূপবান প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন।

'আমাকে মার্জনা করবেন প্রিমরোজ ক্যাম্পবেল, আপনাকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখব বলে ঐ চিঠি লিখে আপনাকে এখানে আনতে হল। যদিও আমি জানি, এ কোনো অন্যায় নয়। আপনার মত কোনো নারীর প্রেমে পড়লে যে কোনো পুরুষই এ জাতীয় কাজ করতে বাধ্য হত।'

'কী বাজে কথা বলছেন আপনি' দরজাটা খুলে দিন।' চিৎকার করে উঠলেন প্রিমরোজ।

দরজা খুলে দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আমাকে বিবাহ করবার সম্মতি দিন আপনি।'

'না, না, তা কী করে হবে। এ হতে পারে না। আপনি পথ ছেড়ে দিন সিমন ফ্রেসার।'

'আহা এত উত্তেজিত হবার কী আছে। ছেড়ে তো আপনাকে দোবোই আমি, কিন্তু তার আগে ভেবে দেখুন তো লোকে আপনাকে কী বলবে·······বলবে কুমারী প্রিমরোজ ক্যাম্পবেল সারা দুপুর এডিন-বারায় এক কুখ্যাত প্রাসাদে সিমন ফ্রেসারের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে।'

হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথাটা শেষ করেই সিমন শয়নকক্ষের সংলগ্ন একটা বন্ধ ঘরের দরজা প্রিমরোজের চোখের সামনে খুলে ধরলেন। আর প্রিমরোজ সেই ঘরের দেওয়ালে ইতর চিত্র ও নগ্ন ভয়ংকর সব মূর্তির স্তূপ দেখে দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

'অতএব বুঝতে পারছেন প্রিমরোজ ক্যাম্পবেল, আমাকে বিয়ে আপনার করতেই হবে।' বলতে বলতে নির্বিকার গলায় হেসে উঠলেন সিমন ক্রেসার। আর সেই মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন প্রিমরোজ।

এরপর প্রিমরোজ ক্যাম্পবেলের সঙ্গে বিবাহের পর সিমন অন্যদিকে মন দিলেন। আর একটি পুত্র সন্তানের জননী হয়েই সিমন ক্রেসাবেব সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটল প্রিমরোজের। সিমন কিন্তু এই বিবাহ বিচ্ছেদে একটুও দমলেন না। বরং রাজনীতিচর্চায় এডোয়ার্ডেব বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন। কুলুডেনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন তিনি আর অবশেষে লর্ড মোরাবে সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন, এক গাছের কোটরে লুকিয়ে থাকা অবস্থায়। বন্দী অবস্থায় তাঁকে লণ্ডনে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হল। আর সেখানে ৯ই এপ্রিল ১৭৪৭ সালেব এক ভোরবেলায় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হল।